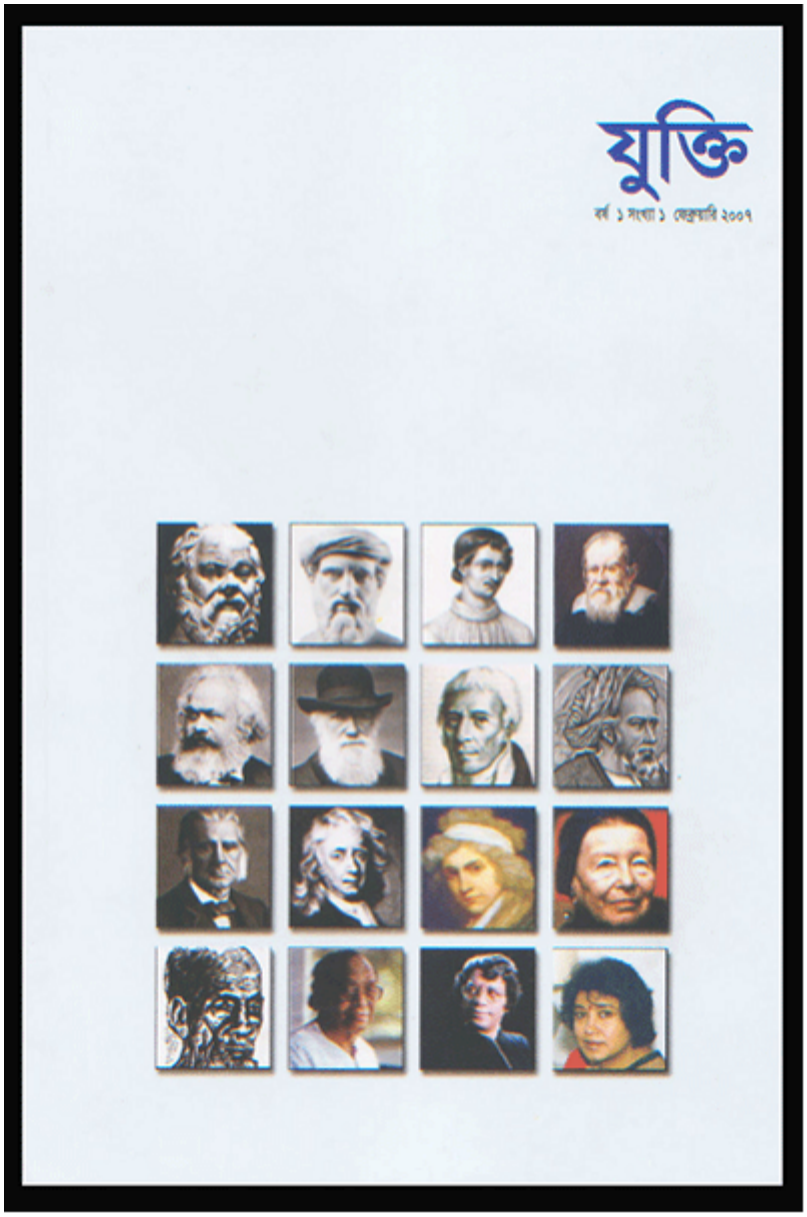

যুক্তি আনে চেতনা

আর চেতনা আনে সমাজ পরিবর্তন

যুক্তি : মুক্তমনা ই-বুক

যুক্তি কে না ভালবাসে? ভালবাসা তো শুধু নয়, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই তো যুক্তির প্রতি আস্থা থাকা প্রয়োজন। সবচেয়ে কট্টর বিশ্বাসী ব্যক্তিটিও কিন্তু যুক্তি ছাড়া এ জগতে এক পাও চলতে পারেন না। যতই বিশ্বাস কিংবা ঈমানের জোর থাকুক না কেন, কেউই হাইওয়েতে গিয়ে চলমান বাসের সামনে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে যান না। কখনই ভাবেন না, 'দাঁড়িয়ে যাই, ক্ষতি কি- বাঁচা মরার মালিক তো আল্লাহ, তিনিই তাঁর বান্দাকে রক্ষা করবেন।' অপার্থিব সত্তার কাছে মগজ বিকিয়ে না দিয়ে বরং আস্থা রাখেন মানবীয়, যুক্তি, সংশয় এবং বুদ্ধির উপর, সব দিক দেখে-শুনেই শেষ পর্যন্ত রাস্তা পার হন। বাজারে গিয়ে ঈশ্বরের নাম জপে চোখ বন্ধ করে কেউ বাজার করেন না, বরং দেখে-শুনে, যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে ভাল মত বিচার করেই জিনিস কেনেন, পাছে ঠকে না যান! এগুলো উদাহরণ থেকে আমাদের পার্থিব জীবনে যুক্তির গুরুত্ব বোঝা যায়। অথচ, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকভাবে যুক্তিবাদী হওয়ার কথা বললে কিংবা যুক্তিবাদ প্রচার করলে অনেকের মাথায় যেন বাজ পড়ে। ইনিয়ে-বিনিয়ে নানা 'আগডুম-বাগডুম' তত্ত্বকথা আর অতিকথা হাজির করে যুক্তিবাদীদের ঠেকাতে সচেষ্ট হন, কখনওবা কথার মার-প্যাঁচ দিয়ে এমন এক অস্তিত্বহীন সত্তার 'অস্তিত্ব প্রমাণে' সচেষ্ট হন, যার প্রতি আসলে তাদের নিজেদেরও ব্যবহারিক জীবনে কোন আস্থা নেই, ছিলও না বোধ হয় কখনও।

এর মধ্যে আমাদের প্রিয় মুক্তমনা সদস্য অনন্ত বিজয় এক অভিনব কাজ করে ফেলেছে। 'মৌলবাদীদের আখড়া' হিসেবে পরিচিত সিলেটে থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের যুক্তিবাদীদের সংগঠিত করে 'যুক্তি' নামের এমন একটি সাহসী পত্রিকা বের করেছে এবারের (২০০৭) বই মেলায়, যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অভূতপূর্বই বলা যায়। এ পত্রিকাটি পড়লেই পাঠকেরা বুঝবেন যে, অনন্ত বিষবৃক্ষের পাতায় পাতায় কাঁচি চালায়নি, বরং কুঠারের কোপ বসিয়েছে একদম গভীরে, বিষবৃক্ষের গোঁড়াতেই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত দৈনিকে ছোট্ট বইটি ইতোমধ্যেই আলোচিত হয়েছে আর সেই সাথে পেয়েছে উগ্র সাম্প্রদায়িক মহল থেকে হুমকি-ধামকিও!!! এধরনের হুমকি ধামকি তো আমাদের মত মুক্তমনাদের কাছে নতুন কিছু নয়! অনন্ত নিশ্চয়ই তা এতোদিনে জেনে গেছে।

আমার অনুরোধে অনন্ত 'যুক্তি' নামের লিটল ম্যাগাজিনটি মুক্তমনায় 'ই-বুক' আকারে প্রকাশের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আমি মনে করি অনুসন্ধিৎসু এবং মননশীল পাঠকেরা এতে খুবই উপকৃত হবেন। মুক্তমনা আন্দোলনের সাথে জড়িত লেখকদেরও বেশ কটি লেখা এতে সন্নিবেশিত করেছে অনন্ত। আমরা এর আগে মুক্তমনার পক্ষ থেকে 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' এবং 'বিবর্তনের পথ ধরে' বই দুটি ই-বুক আকারে প্রকাশ করেছিলাম। সেই একই ধারাবাহিকতায় এবার প্রকাশিত হল 'যুক্তি'। বইটি সুতনী ফন্টে লেখা হয়েছে। ম্যাগাজিনটি ঠিকমত পড়তে না পারলে দয়া করে সুতনী ফন্ট আমাদের ওয়েব সাইট থেকে ডাউনলোড করে নিন।

অনন্তকে তাঁর এই সাহসী পদক্ষেপের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি যুক্তির বহুল প্রচার কামনা করি।

অভিজিৎ রায়
মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
১৭ এপ্রিল, ২০০৭

যুক্তি

ফেব্রুয়ারি ২০০৭

●●●

যুক্তি

বর্ষ ১ সংখ্যা ১ ২০০৭

সম্পাদক
অনন্ত বিজয় দাশ

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
lekhok@inbox.com

প্রচ্ছদ পরিকল্পক
বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল, সিলেট

প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৪১৩, ফেব্রুয়ারি ২০০৭

মুদ্রক
প্যারাডাইম অফসেট প্রেস
রাজা ম্যানশন, দ্বিতীয় তলা, জিন্দাবাজার, সিলেট

পরিবেশক
তক্ষশিলা, আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা
বইপত্র, উত্তর জিন্দাবাজার, সিলেট

সার্বিক যোগাযোগ
মুঠোফোন : ০১৭১২ ৯৬৬৮১৩, ০১৭১২ ৯৯১৮৫৬
yukti@inbox.com

মূল্য
৫০ টাকা

সূচি

প্রবন্ধ

ব্রুনো থেকে আরজ আলী মাতুব্বর/অজয় রায় ৭
ঈশ্বরই কি সৃষ্টির আদি বা প্রথম কারণ?/অভিজিৎ রায় ১৬
মানুষের বিবর্তন/বন্যা আহমেদ ২১
আগামীদিনের মুক্তমনা/আকাশ মালিক ৩২
নারীবাদ ও নারীবাদী/নন্দিনী হোসেন ৩৪
মোহনীয় মোনালিসা/ফরিদ আহমদ ৩৬

কবিতা

ড. ইউনূস-শান্তিপুরস্কার/মৌ মধুবন্তী ৫২

প্রবন্ধ

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানমনস্কতা বনাম কোরানিক বিজ্ঞান/জাহেদ আহমদ ৫৪
যুক্তিবাদ : একটি দর্শন একটি আন্দোলন/মফিজুর রহমান রুন্নু ৬৬
আলোকবিন্দু/অরুণকান্তি দাশ ৭২

ছোটগল্প

রাশার খণ্ডিত পৃথিবী/মাহ্‌মুদ আলী ৭৪

প্রবন্ধ

অস্থির সময় স্বপ্নহীন ভবিষ্যৎ/অ.আ.ম. রেজা ৮১
দাজ্জালের কথা/জাহিদ রাসেল ৮৪
সিলেটি মৌলবাদ/সুমন তুরহান ৯০
ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল- এর কাছে খোলা চিঠি/ফাতেমা রেজমিন ৯৬
মুসলিম দর্শনে মুতাজিলাবাদ/মনির হোসাইন ১০০
কালের আয়নায় নারীমুক্তির হালচাল/এম এ আলিম ১০৮
হায় স্বপ্ন! হায় সভ্যতা!/লিটন দাস ১১৪
ধর্মবিশ্বাসে যুক্তির সংকট/সৈকত চৌধুরী ১১৬

অনুবাদ

মুক্তচিন্তক পরিচিতি/ড্যান বার্কার ; অনুবাদ : মিহিরকান্তি চৌধুরী ১২২

প্রবন্ধ

যুক্তি ও যুক্তিবাদ/অনন্ত বিজয় দাশ ১২৫

সম্পাদকীয়

আন্ধারে ভরা রাতি, আলেয়া জ্বালায় বাতি ।
বল না, বল না, কে যাবি, আনতে ভোর ... ॥

মানুষ তার এই আপন মাতৃভূমিতে পদচারণার সময় থেকে খুঁজে ফিরছে নিজের শিকড় । এই শিকড় খুঁজতে গিয়ে মানুষ বারেবারে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে, উত্তর খুঁজেছে আপন মনে । কখনও পেয়েছে কিছু কিছু উত্তর প্রত্যক্ষ প্রমাণ–ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের মাধ্যমে আর কখনওবা হাতড়ে হাতড়ে চলছে, এখনও । কেউবা উত্তর খুঁজতে গিয়ে ধৈর্য্য হারিয়ে কিংবা স্বার্থের লোভে তৈরি করেছে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা, প্রথা আর নিয়মের নামে শোষণের কৌশল । মনীষী মার্কস বর্ণিত আফিমে আসক্ত, বিশ্লেষণী জ্ঞানচর্চায় উদাসীন শ্রেণীবিভক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তা মেনে নিয়েছে । ফলে, গুটিকয় সুযোগ-সন্ধানী সওদাগর সিন্দাবাদের ভূতের মতো আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাঁধে চেপে বসে আছে যুগ যুগ ধরে । ভৌতিকোপন্যাসের চরিত্র ড্রাকুলা'র মতো আমাদের রক্ত খেয়ে নিজের উদরপূর্তি করে চলছে ওরা! কিন্তু আমরা দেখেছি, ইতিহাস সবসময় এই ড্রাকুলাদের বিপরীতে অবস্থান করে । ড্রাকুলাদের হাত থেকে আপন ধরণী রক্ষার জন্য সবসময়ই প্রথাবিরোধী কালোত্তীর্ণরা নিজের জীবন বাজি রেখেছেন । এই প্রথাবিরোধী বিরুদ্ধস্রোতের যাত্রী কালোত্তীর্ণদের তালিকা কিন্তু নেহায়েতই কম নয় । এই তালিকায় যেমন রয়েছেন খ্রিস্টপূর্বের অনেক মনীষী তেমনি বর্তমান কালের অনেক জ্ঞানীগুণী; যেমন গৌতম বুদ্ধ, চার্বাক, বৃহস্পতি, মহাবীর, অজিত কেশকম্বল, মক্ষলি গোশাল, কপিল, হেরাক্লিটাস, এ্যানাক্সিগোরাস, পিথাগোরাস, ডেমোক্রিটাস, সক্রেটিস, হাইপেশিয়া, আল্লাফ আবুল হুজৈল আল আল্লাফ, নজ্জাম, জাহিজ, আবু হাসিব, ওমর খৈয়াম, ইবনে সিনা, কোপার্নিকাস, ব্রেনো, গ্যালিলিও, নিউটন, ডারউইন, কার্লমার্ক, মেরী ওলস্টোনক্রাফট, সিমোন দ্য বোভোয়ার, আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আব্দুল কাদির, আবুল ফজল, আরজ আলী মাতুব্বর, আহমদ শরীফ, হুমায়ুন আজাদ, তসলিমা নাসরিন প্রমুখ । এভাবে ক্রমেই তালিকা দীর্ঘায়িত করা যায় । আমরা ঐতিহ্যগতভাবে তাঁদেরই উত্তরসূরি । বুদ্ধির মুক্তি এবং মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনে, বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ বিনির্মাণে আমরা প্রেরণা পাই এই দৃঢ়চিত্ত মুক্তচিন্তার মনীষীদের কর্মস্পৃহা থেকে । আমাদের চেতনায় মুক্তমন, চর্চা করি বিজ্ঞানমনস্কতা আর যুক্তিবাদিতার ।

বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্যের সমন্বয়ে বেশকিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ, অনুবাদ ছাড়াও সাম্প্রতিক ইস্যু নিয়ে শুরু হল যুক্তির প্রথম যাত্রা । আশা করি, প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বাইরে থেকে রচিত যুক্তি সকলশ্রেণী পাঠকের গ্রহণযোগ্যতা পাবে । আমরা শ্রদ্ধার সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সকল লেখকের কাছে, যারা নিজেদের প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মাঝে সময় বের করে, আমাদের জন্য দু' কলম লিখেছেন, এই সাথে আমার আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তাদের কাছে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যাদের লেখা বর্ধিত কলেবরের কারণে ছাপানো সম্ভব হলো না । আন্তরিকতা আর নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও এবারের সংখ্যায় অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ভ্রান্তি রয়ে গেল, পাঠকের কাছে অনুরোধ-এইসকল ভুলভ্রান্তি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে এবং সাথে সাথে এগুলো ধরিয়ে দেয়ার জন্য, যাতে ভবিষ্যতে আমরা সংশোধন করতে পারি । সবশেষে, আমরা স্পষ্টভাবে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এই সংখ্যায় প্রকাশিত সকল লেখাই লেখকগণের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, অভিমত এবং তথ্যসংকলন; এর সাথে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল কোনোভাবেই (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) সম্পৃক্ত নয় । আমরা মনে করি, প্রকাশিত যে কোনো বিষয়বস্তুর সাথে যে কেউ ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন এবং প্রকাশের জন্যে আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন । প্রকাশযোগ্য হলে, আমরা অবশ্যই পাঠকের ভিন্নমত আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করব ।

অনন্ত

বিজ্ঞান নিয়ে ভাবনা

ব্রুনো থেকে আরজ আলী মাতুব্বর

অজয় রায়

ছাত্রবন্ধুদের জন্য বিজ্ঞান নিয়ে কিছু কথা বলতে হবে, অনুরোধ এসেছে-আর এ বন্ধুদের শিক্ষার স্তর মাধ্যমিক বা তার চেয়ে কম। এই অনুরোধ করার পেছনে আছে বস্তুবাদী দার্শনিক আরজ আলীর দর্শন ও তাঁর বৈজ্ঞানিক মতকে আবিষ্কার করার আগ্রহ। আরজ আলী মাতুব্বর আমাদের দর্শনচর্চার ক্ষেত্রে আধুনিক কালে একটি উজ্জ্বল সংযোজন। তাঁর সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ বাড়ছে, এটি শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু আরজ আলীকে বুঝতে হলে চাই বিজ্ঞানের চর্চা করা, বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা। এই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখেই এই ক্ষুদ্র রচনাটির প্রয়াস।

সাধারণ মানুষের বিজ্ঞান নিয়ে রয়েছে নানা কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা। তারা ভাবে বিজ্ঞানের কল্যাণে জীবনে এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য ও আয়েস। গরমের দিনে, যাদের সামর্থ্য আছে তারা তালপাখার পরিবর্তে বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস খেতে পারে, পায়ে হাঁটার পরিবর্তে সাইকেলে চড়তে পারে, গরুর গাড়ির পরিবর্তে বাসে উঠতে পারে, মাটির জায়গায় শানবাঁধান রাস্তার ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে পারে। নৌকায় নদী পার না হয়ে পুলের ওপর দিয়ে হেটে সহজে নদী পার হতে পারে। আরও বিত্ত থাকলে গ্রামেও কুঁড়েঘরের পরিবর্তে ইটের সুন্দর বাড়িতে বসবাস করতে সক্ষম। বিত্ত থাকলে শহরেও গাড়ি বাড়ি নিয়ে শান-শওকতের সাথে থাকা যায়, এও সাধারণ মানুষ জানে।

চিত্র : ব্রুনো

সাধারণ মানুষ এও জানে যে বিজ্ঞানের দৌলতে কৃষিতে ফলন বেড়েছে, নানা ধরনের জৈব-অজৈব সার ব্যবহারে জমির উর্বরা শক্তি বাড়ে; প্রতি নিয়ত উচ্চফলনশীল বীজ কৃষকের হাতে এসে পৌঁছাচ্ছে গবেষণাগার থেকে। হাতে পয়সা থাকলেই কৃষক বিজ্ঞানের এসব সুযোগসুবিধা গ্রহণ করতে পারে। হালের বদলে এসেছে কলের লাঙল বা পাওয়ার টিলার। কিন্তু বড় সমস্যা হল কৃষকের হাতে টাকা থাকা। ক্ষুদ্র চাষীদের হাতে পয়সা নেই, আর ভূমিহীনদের জমিই নেই। সুতরাং কৃষিও এখন আর পাঁচটা বৃত্তির মত অর্থের লগ্নিকরণ বা ইনভেস্টমেন্ট যা ক্রমেই সাধারণ কৃষকের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ধনী কৃষকরাই পারে অর্থলগ্নি করে কৃষিখাত থেকে সম্পদের ওপর সম্পদ গড়ে তুলতে। তাই ধনী কৃষকদের ঘরে এখন শোভা পায় দামী সোফাসেট, কাঠের চেয়ারের পরিবর্তে। সুদৃশ্য পর্দাঘেরা ড্রইংরুমের পরিবেশ এখন দুর্লক্ষ্য নয় গ্রামীণ পরিবেশেও। ফ্রিজ আছে, রঙিন টিভিও রয়েছে। অনেকের বাড়িতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও রয়েছে। কিন্তু দরিদ্র কৃষকরা অর্থলগ্নি করে চাষ করতে না পারায় অসম প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে আর চাষযোগ্য জমি বেচে দিতে বাধ্য হচ্ছে ধনী কৃষকদের কাছে, আর তাই ভূমিহীনদের সংখ্যা বাড়ছে। গ্রামে বাড়ছে মানুষের মধ্যে আর্থিক ব্যবধানের অসমতা। ফলে সামাজিক ভারসাম্যও বিনষ্ট হচ্ছে গ্রামে। এটাও কিন্তু বিজ্ঞানের দান। তাই অনিবার্য হিসেবে সিদ্ধান্ত এসে পড়ে যে, সমাজকাঠামোতে সমতা না এনে শুধু বিজ্ঞানের অবদানকে কাজে লাগিয়ে সকল শ্রেণীর মানুষের উপকার করা যায় না, বরং সমাজের আর্থিক ভারসাম্য নষ্ট করে, সৃষ্টি করে প্রকট শ্রেণীবৈষম্য কারণ উন্নত উৎপাদনব্যবস্থাগুলো একটি অর্থবান শ্রেণীর সম্পদে পরিণত হয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উন্মেষের সাথে শ্রেণীহীন সমাজ-উন্মেষের কথাও ভাবতে হবে সমাজতন্ত্রের আদর্শবাদীদের বা কল্যাণমূখী রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্মাণের ভবিষ্যৎ স্থপতিদের।

সাধারণ মানুষ এও জানে যে, বিজ্ঞান চিকিৎসাব্যবস্থায় বিপ্লব এনেছে- টাইফয়েড-কলেরায় লোক মরে না, গ্রামের পর গ্রাম আজ আর উজাড় হয়ে যায় না বসন্ত রোগে। গ্রামেও প্রসূতি ও শিশুমৃত্যু অনেক কমে এসেছে। যক্ষা রোগ আজ আর কালব্যাধি নয়, কুষ্ঠরোগ সম্পূর্ণ

নিরাময়যোগ্য এবং ছোঁয়াচে নয়। গ্রামের অশিক্ষিত মানুষও জানে এগুলো সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের কল্যাণে, বিজ্ঞানীদের নিরলস সাধনায়। বিজ্ঞান নিয়ে মানুষের অন্যধরনের কৌতুহলের অভাব নেই। সে ভাবে কিভাবে অনেকদূর থেকে মানুষের সাথে কথা বলা যায় তারের মধ্য দিয়ে, অনেকসময় বিনা তারেও রেডিও-টিভির যন্ত্রের মাধ্যমে। সে এও শুনেছে শুধু মাটির পৃথিবীতে নয়, মানুষ চাঁদে নামছে, বিভিন্ন গ্রহে যান পাঠিয়ে কেমন করে ভিন্নলোকের ভেতরের খবর পৃথিবীতে বসেই সংগ্রহ করে আনছে। এ নিয়ে আমাদের দেশের মানুষের জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। কিন্তু আমাদের দেশের সবজান্তা ফতোয়াবাজ মৌলভিরা এসবের ব্যখ্যা দিতে পারেন না, কারণ ধর্মপুস্তকের বাইরে এদের কোনো জ্ঞান নেই। আর শতশত বর্ষ আগে লেখা ঐসব পবিত্র গ্রন্থাদিতে বিজ্ঞানের কোনো কথা নেই, থাকার কথাও নয়, কারণ তখন আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হয় নি।

কিন্তু এতো গেল অর্থনৈতিক ব্যবধান সৃষ্টিতে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ। আরও আছে, সভ্য সমাজে বিজ্ঞান রূপান্তরিত হয়েছে অজ্ঞানতা, কুপ্রথা, অন্ধবিশ্বাস-ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ারে। কিন্তু আমাদের দেশে, সাধারণ মানুষ তো বটেই শিক্ষিত মানুষও বিজ্ঞানকে দেখে আরাম-আয়েশ, ভোগবিলাস ও জীবনের মান বৃদ্ধির উপকরণ হিসেবে। বিজ্ঞান যে যুক্তিবাদী একটি প্রক্রিয়া যা অন্ধকারকে দূর করে আলো জ্বালায়, সে অর্থে আমরা বিজ্ঞানকে গ্রহণ করি নি। এখনও আমাদের অগাধ বিশ্বাস পির হুজুরদের তুক্তাকে। আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ্তালা চাইলে রোগশয্যায় শায়িত যে কোনো রুগ্নব্যক্তি বিনা ওষুধে নিরাময় হতে পারে। আমরা এখনও পাগলের চিকিৎসার জন্য রোগীকে মনোবিজ্ঞানীর পরিবর্তে পিরের আস্তানায় নিয়ে যেতে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। মনোবিজ্ঞানীর ফিজিওথেরাপির পরিবর্তে আমাদের আস্থা পিরের ঝাড়ফুঁক, তুক্তাক, প্রহারসহ শারীরিক নির্যাতনী নানা উদ্ভট প্রেসক্রিপশনে। আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে, পিরের ফুঁ ও পানিপড়ার ক্রিয়া অ্যান্টিবায়োটিকের ক্রিয়ার চাইতে অধিক কার্যকর। আমরা বিশ্বাস করি পিরের আশীর্বাদে পরীক্ষায় ভাল ফল করা যায়, চাকুরীতে পদোন্নতি হয়, মামলায় জেতা যায়–হারানো জিনিস ফেরৎ পাওয়া যায়-বন্ধ্যানারী গর্ভবতী হয়। কি না সম্ভব হয় পির-দরবেশের আশীর্বাদ ও দোয়ায়। সুতরাং পিরব্যবসার যে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি ঘটবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

শুধু দরিদ্র আর অশিক্ষিত মানুষেরাই কি অন্ধবিশ্বাসী আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন? না, মৌলবাদী ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-অধ্যাপক-বিজ্ঞানীর অভাব নেই এদেশে। এমনতর অভিজ্ঞতা হয়েছে যখন অনেক ডাক্তারই তার রোগীকে বলে থাকেন " আমরা তো চেষ্টা করি মাত্র, ভাল করার হাত তো আল্লাহ্র কাছে।" জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, "আল্লাহ্র যদি হাত, তাহলে আপনার হাতে টাকা গুঁজে দেয়া কেন? মসজিদে বা পিরের দরগায় ধরনা দিলেই তো হয়।" কিন্তু আমরা জিজ্ঞেস করি না, পাছে ডাক্তার সাহেব রুষ্ট হন, রোগীর ক্ষতি হয়। দেশটিতে কীভাবে অন্ধবিশ্বাসের আবহ সৃষ্টির চেষ্টা চালানো হচ্ছে, তা দেখলাম ঢাকা-চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে। কিছুদূর পর পরই কোরানের বাণী উৎকলিত সিমেন্টের স্ল্যাব বসানো হয়েছে রাস্তার পাশে– ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে; কোনটিতে নামাজ রোজা পালনের উপদেশ; একটিতে দেখলাম লেখা হয়েছে, "আল্লাহ্তালার হুকুম ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না .. .. ।" অথচ ধর্মব্যবসায়ীরা বলে থাকেন যে মানুষ আল্লাহতালার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তাকে জ্ঞান ও বিবেক দেয়া হয়েছে। এখন আল্লাহ্তালার ইচ্ছে ছাড়া যদি মানুষ তার একটি অঙ্গুলিও নাড়াতে না পারে, তাহলে সে জ্ঞানচর্চা কী করবে, স্বাধীন চিন্তা করবে কেমন করে ? আর জ্ঞানসৃষ্টির মূল চাবিই তো স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা। আর এটি আছে বলেই মানুষ অন্য জীব থেকে স্বতন্ত্র প্রাণী। অথচ ধর্মব্যবসায়ীরা কোরানের এই বাণীর মধ্যে স্ববিরোধিতা খুঁজে পান না। কোরানের আরও একটি বাণী– মহাসড়কের বাঁকে বাঁকে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কল্যাণে প্রদর্শিত হচ্ছে– " আল্লাহ্তালার ইচ্ছে ছাড়া কেউ কারও প্রাণ হরণ করতে পারে না।" কী সাংঘাতিক বাণী জনে জনে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। আর এজন্যই হয়তো সরকারের এক সময়ের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল সেই ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন, "জীবন মরণ আল্লাহ্র মওদুদ, আল্লাহ্র মাল আল্লাহ্ নিয়ে গেছেন।"

ড. হুমায়ুন আজাদের খুনীরা কিংবা সাংবাদিক ও বিচারকদের হত্যাকারীরা যদি বলে যে আমাদের ইচ্ছে শক্তি নেই– আমরা তো কলের পুতুল আল্লাহ্র ইচ্ছেতেই চলি, কাজ করি– আল্লাহ্ই আমাদেরকে দিয়ে হুমায়ুন আজাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন, সাংবাদিক ও বিচারকদের হত্যা করিয়েছেন। সাক্ষ্য হিসেবে আদালতে যদি কোরানের এসব বাণী উপস্থাপন করা হয়, তাহলে মাননীয় আদালত কী করে কোরানের বাণীর বিপরীতে কাজ করবেন!

আমদের দেশের জ্ঞানপাপী বিজ্ঞানীরা আমাদের সমাজের সবচাইতে ক্ষতিকর কাজটি করছেন যখন তাঁরা বলেন– প্রাণের উন্মেষসহ মহাবিশ্ব সৃষ্টির সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য মহাপবিত্র গ্রন্থটিতে রয়েছে– আমরা মূর্খ মানুষেরা তা বুঝতে অক্ষম, আর মূর্খ মানুষদের বোঝানোর দায়িত্ব এই ধর্মব্যবসায়ী বিজ্ঞানীরা নিজ স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন। অথচ আমরা কেন ভুলে যাই যে পবিত্র গ্রন্থটি এসেছে সাধারণ মানুষের জন্য। সাধারণ মানুষ যদি এর বাণী ও মর্মার্থ বুঝতে না পারে তাহলে কোরান অবতীর্ণ হওয়ার মানে থাকে না, এর মূল উদ্দেশ্যটিই অসার হয়ে পড়ে। কারণ ধর্মপ্রাণ সরল মুসলমান বিশ্বাস করে যে কোরান এমন সহজ সরল সাধারণ মানুষের জন্য লেখা যে এর মর্মার্থ বুঝতে কোন আলেম বা ব্যাখ্যাকারের প্রয়োজন নেই। কেন না ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসী মনে করেন ইসলামে ৩য় কোন ব্যক্তি বা গুরুর প্রয়োজন নেই। আমরা প্রায়শ ভুলে যাই কোরান এসেছে আরবদেশের তৎকালে বিরাজিত আরববাসীর সামাজিক প্রেক্ষাপটে মুখ্যত পশ্চাদপদ অন্ধকারাচ্ছন্ন এক দল মানুষের মুক্তির বার্তা নিয়ে। তাই এখানে সহজ সরল ভাষায় তৎকালের মানুষের জ্ঞানের স্তরের কথা মনে রেখে সাধারণ মানুষের বোধ্য ভাষাতেই সৃষ্টির কথা, মানুষের জন্মের কথা, প্রাণীজগতের কথা, মহাবিশ্বেও জ্যোতিষ্কদের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। সব কিছু সৃষ্টির মূলে রয়েছে আল্লাহ্তালার মহান ইচ্ছার প্রকাশ একটি মাত্র শব্দে "হও"। আর এ কথাটিই হল অজৈব-জৈব মহাবিশ্ব সৃষ্টির পশ্চাতে আসল তত্ত্বকথা। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করে নি, তিনি স্বয়ম্ভু কালের আদিতেও ছিলেন, কালের পরও থাকবেন, স্থান সৃষ্টির আগেও ছিলেন, স্থান বিলুপ্তির পরেও থাকবেন। কোথায় থাকবেন, কেমন করে থাকবেন বিশ্বাসীদের কাছে এ প্রশ্ন অবান্তর। জ্ঞানপাপী মহাবিজ্ঞানীরা আমাদের আপ্রাণ বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে, প্রাণের

বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব অর্থাৎ প্রাণবিজ্ঞানীরা বর্তমানে যা বলছে তা পবিত্র মহাগ্রন্থটির কোন না কোন সুরায় বা কোন না কোন আয়াতে বিস্তৃত রয়েছে। মহাবিশ্ব সৃষ্টির তত্ত্ব মহাবিস্ফোরণের (big bang) কথাও ঐ গ্রন্থে রয়েছে। বিজ্ঞান মহলে প্রাণসৃষ্টি তত্ত্বেও শেষ কথা বলা হয়েছে এমনটি দাবি করা হয় নি। কিন্তু কোরানিক বৈজ্ঞানিকেরা ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানীদের অসুম্পূর্ণ তত্ত্বের সমর্থন খুঁজে পেয়েছেন ঐ গ্রন্থে। আর মহাবিশ্ব সৃষ্টি তত্ত্বেরও শেষ কথা বলার সময় এখনও হয় নি। পদার্থবিদদের কাছে এখনও দুটি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা চলছে। একটি হল সাম্প্রতিক কালের মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব যা আদিতে একটি অদ্বৈত বিন্দু থেকে (singularity) যাত্রা শুরু করেছিল। আর দ্বিতীয়টি হল জ্যোতির্বিজ্ঞানী নার্লিকার-হয়েল স্থির বিশ্ব তত্ত্ব – এর কোনো সৃষ্টি কাল নেই ছিল না– অনন্তকাল ধরেই এই বিশ্ব ছিল, অনন্তকাল ধরেই এটি থাকবে, এর কোনো লয় নেই। তত্ত্ব দুটি পরস্পর বিরোধী। তবে বর্তমানে যে প্রমাণ সাক্ষ্য, প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে রয়েছে তা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের প্রতিই সমর্থন যোগাচ্ছে। তবে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসে নি। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের নবতর প্রমাণ ও সাক্ষ্য উপস্থিত হলে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব পরিত্যাজ্য বা পরিমার্জিত হয়ে উন্নততর তত্ত্ব উদ্ভাবিত হতে পারে, এমনকি হয়েলের তত্ত্বেও প্রত্যাবর্তনকে একেবারে নস্যাৎ করা যায় না। এ রকমটি ঘটলে জ্ঞানপাপী বিজ্ঞানীদের অবস্থা কী দাঁড়াবে ভাবা যায় না। কোরানের শাশ্বত বাণীর ভুল ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য এদেরকে অভিযুক্ত করা যেতে পারে।

আমরা ভুলে যাই যে ধর্ম পুস্তকগুলিকে বিশ্বাসের ভিত্তি হিসাবে দেখা উচিৎ, কোনো বিজ্ঞানের মহাগ্রন্থ যেখানে বিজ্ঞানের সব সত্যই পাওয়া যাবে- এ ধারণা অবশ্য পরিত্যাজ্য। তা না হলে বিশ্বাসের ভিত্তিটাই নড়ে উঠবে। বিজ্ঞান ও ধর্ম এক জিনিস নয়। দুটিকে গুলিয়ে ফেলাও ঠিক হবে না। ধর্ম বিশ্বাসের বস্তু, – এখানে যুক্তি, জিজ্ঞাসা আর অনুসন্ধিৎসার স্থান নেই। কিন্তু বিজ্ঞান যুক্তি (logic), যুক্তিবাদিতা (rationalism), জিজ্ঞাসা আর অনুসন্ধিৎসার পথ ধরে এগুতে থাকে। আর তাই বিজ্ঞানে চরম সত্য বা শেষ জ্ঞান বা পরম জ্ঞান বলে কিছু নেই। বিজ্ঞান নিয়ত নতুন সত্য উদ্ঘাটন করে – নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করে অহরহ। তাই বিজ্ঞানকে কালের গণ্ডীতে বেঁধে রাখা যায় না। অথচ ধর্ম কালকে থামিয়ে দিতে চায় – কালকে বন্দী করে রাখতে চায়। তাই ধর্মগ্রন্থগুলি দাবি করে যে, যেখানে যে কথাগুলি বলা হয়েছে তা সর্বকালের জন্য, সর্বস্থানের জন্য সত্য, এবং একমাত্র সত্য। এক কথায় মহাগ্রন্থগুলির বাণীগুলি শাশ্বত – স্থানকাল অনপেক্ষ। আর এখানেই বিজ্ঞানের কৌতুহলী ও জিজ্ঞাসু মনের সাথে ধর্মের চিরশাশ্বত মনোভাবের ঘটে সংঘর্ষ। তাই সভ্যতার লগ্ন থেকেই উদার দার্শনিক ও বিজ্ঞানের মতের সাথে চার্চের ও অন্যন্য ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানকে পথ করে নিতে হয়েছে। এই সংঘর্ষে ও বৈপরীত্য দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে মানুষের অনুসন্ধিৎসু মন ও জানার অতুল আগ্রহ – ধর্মের নিষেধাজ্ঞা তাকে বিরত রাখতে পারে নি।

আমরা এখানে স্মরণ করতে চাই যে ৪০৬ বছর আগে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ১৭ ফেব্রুয়ারিতে ইতালির তৎকালের মুক্তমনা দার্শনিক লিওনার্দো ব্রুনোকে ৬ ঘণ্টা ধরে তৎকালের চার্চের ধর্মগুরু মহামতি পোপের নির্দেশে 'ব্লাসফেমি'র অপরাধে অর্থাৎ ঈশ্বর ও চার্চের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা বলার অপরাধে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হয়। ব্রুনোর কী অপরাধ ছিল? তিনি তো নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না, খ্রিস্ট ধর্মও তিনি ত্যাগ করেন নি। তিনি সারা জীবন শুধু প্রচার করেছেন যে ঈশ্বরের কাছে সাধারণ মানুষ থেকে ঈশ্বরপুত্র যিশু বা চার্চের প্রধান ধর্মগুরু পোপ সবাই সমান – তাঁর ভালবাসা সবার জন্যই অসীম ও অপার। কিন্তু চার্চের মত ছিল যে ঈশ্বরের ভালবাসা অসীম শুধু যিশুর জন্য, পোপের জন্য, ধর্মযাজকদের জন্য – সাধারণ পাপী মানুষের জন্য ঈশ্বরানুগ্রহ দয়া ও ভালবাসা সসীম। এছাড়া ব্রুনো প্রচলিত বাইবেলে উল্লিখিত সৃষ্টিতত্ত্বীয় মতের বিরুদ্ধে নিজস্ব দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচার করতেন – পৃথিবী ও জীবজগতের সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতিক নিয়মে, পরস্পর সম্পর্কিত বস্তুকণিকার সংশ্লেষণ-মিশ্রনে, কোনো অলৌকিক ঈশ্বরের ইচ্ছায় নয়।

ঠিক একই কারণে আধুনিক বিজ্ঞানের পথ প্রদর্শক মহাবিজ্ঞানী গ্যালিলিওকেও চার্চের হাতে সারা জীবন ধরে উৎপীড়িত হতে হয় তাঁর বৈজ্ঞানিক মতবাদের জন্য– যা ছিল চার্চের বিশ্বাস-বিরুদ্ধ। পোপ তাঁকে বাধ্য করায় এ কথা বলাতে, যে তাঁর মতবাদ ছিল মিথ্যা ও ভ্রান্ত। অত্যাচার সইতে না পেরে বৃদ্ধ গ্যালিলিও মেনে নিয়েছিলেন চার্চের নির্দেশ। ধর্মদ্রোহিতার অপরাধ নিয়ে গ্যালিলিও মৃত্যুবরণ করেছিলেন ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু প্রচার না করেও আমৃত্যু চালিয়ে গিয়েছিলেন বিজ্ঞান সাধনা; নিভৃতে লিখে গেছেন তাঁর আবিষ্কারের কথা। চার্চ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, বিজ্ঞানী জয়ী হয়েছেন শেষে।

অবশেষে চার্চ নতিস্বীকার করেছে ১৯৯২ সালে ৩১ অক্টোবরে একটি ঘোষণার মধ্য দিয়ে– জনসাধারণের কাছে ক্ষমা চেয়ে যে সেদিনের রোমান চার্চ ব্রুনো ও গ্যালিলিওর প্রতি, বিশেষ করে ব্রুনোর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য। ৪০৬ বছর আগে বিচারকালে সাহসের সাথে ব্রুনো পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস, যা আজও আমাদের সাহস যোগায় আমরা যারা মুক্তবুদ্ধি ও বিজ্ঞান চর্চার অনুসারী।

"আমার বিশ্বাসের কথা আপনাদের বলতে চাই না। কালই সব দিয়ে থাকে, আবার কালই সব হরণ করে। সব কিছুই পরিবর্তিত হয়, কোনো কিছুরই ধ্বংস নেই। কেবল, হ্যাঁ কেবল মাত্র একটি সত্ত্বাই অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত এবং সর্বংসহ – তা হল আমার সত্তা। এই দর্শনের বলেই আমার আত্মা উজ্জীবিত হয়, আমার মন প্রসারিত হয়। ... রাত যতই তমসাচ্ছন্ন হোক না কেন, আমি প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করব, আর যারা দিনে প্রতাপের সাথে বিচরণ করে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে রাতের তমসা ... অতএব আনন্দ কর , এবং সমগ্রকে তুলে ধরো যদি পারো, আর ভালবাসাকে ভালবাসা দাও।"

এই আমাদের পৃথিবী, এই নক্ষত্র, – এরা কেউ মৃত্যুর অধীন নয়। এবং প্রকৃতিতে কোথাও বিলীন বা ধ্বংস নেই, তা অসম্ভব; তবে কালের পথ ধরে এদের এবং এদের অংশবিশেষের পরিবর্তন ঘটে থাকে। এ্যারিস্টটল যেমন বিশ্বাস করতেন 'পরম উর্ধ বা পরম অধঃ' বলে কিছু নেই; মহাস্থানে পরম অবস্থান নেই; একটি বস্তুর অবস্থান অন্য কোন বস্তু বা বস্তুনিচয়ের সাপেক্ষে নির্ধারিত। মহাবিশ্বের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্থানে

অবিরাম ঘটছে আপেক্ষিক অবস্থানিক পরিবর্তন, আর পর্যবেক্ষক সব সময় কেন্দ্রে অবস্থিত ।" এই ছিল ব্রুনোর দার্শনিক মতবাদ ।

এর পর থেকেই বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান সাধকের কাছে ব্রুনো হয়ে উঠেছিলেন মুক্তচিন্তা আর প্রগতিশীলতার প্রতীক, – বিজ্ঞান ও দর্শনচর্চার রাজ্যে আলোকবর্তিকা । শুধু কি খ্রিস্টান চার্চ ও পাদ্রীদের হাতেই মুক্তমনারা নিগৃহীত হয়েছিলেন? নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের গোঁড়াপন্থী প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতেও নিপীড়িত ও অত্যাচারিত হয়েছিলেন মুক্তচিন্তার ধারক আরব বৈজ্ঞানিক ও দর্শনের পণ্ডিতেরা । মুতাজিলা নামে পরিচিত মুক্ত ও লোকায়ত দর্শনকে নির্মূল করা হয় আরবীয় জ্ঞানরাজ্য থেকে । ইসলামী বিশ্বে ইমাম গাজ্জালীর ভূমিকা ভারতীয় বৈদান্তিক দর্শনের শঙ্করাচার্যের ভূমিকার চাইতে কোন অংশে কম ক্রুর ছিল না । গোঁড়াপন্থীদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আধুনিক চিকিৎসার পথপ্রদর্শক ইবনে সিনাকে (১০৩৭ খ্রিস্টাব্দ) ক্রমাগত পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে, জ্যোতির্বিদ ও ভারততত্ত্ববিদ আলবেরুনীকে (৯৭০-১০৫৮) সর্বদা গ্যালিলিওর মত নতমস্তকে মৃত্যুভয়ে জর্জরিত থেকে বিজ্ঞান ও গণিত চর্চা করতে হয়েছে । মুক্তচিন্তার ধারক জ্যোতির্বিদ-গণিতজ্ঞ ওমর খৈয়ামকে শেষ পর্যন্ত রক্ষণশীলদের ভয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য বিজ্ঞান সাধনা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা পরিত্যাগ করে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছেন আর শেষপর্যন্ত কবিতা লেখায় আত্মনিয়োগ করেছেন ।

ভারতবর্ষেও রক্ষণশীলসমাজ চার্বাক ও লোকায়ত দর্শনকে গলা টিপে হত্যা করেছে আর তাদের রচনাবলিকে চিরকালের জন্য ধ্বংস করে দিয়েছে । এ দর্শনের ছাত্র ও অনুসারীদের যুগযুগ ধরে নিপীড়ন করা হয়েছে । আর্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্তের মত জ্ঞানসাধকদের ধর্মের সাথে আপোস করে তাদের বিজ্ঞানসাধনাকে এগিয়ে নিতে হয়েছে । পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণনশীল আর্যভট্টের এই মতে বিশ্বাসী হয়েও বরাহমিহিরকে প্রকাশ্যে বলতে হয়েছে 'পৃথিবীর ঘূর্ণন তত্ত্বটি' একটি বিকল্প পথ মাত্র, আসল তত্ত্ব হল সূর্যই ঘুরছে, পৃথিবী নয়- যা প্রাচীনেরা বলে থাকেন ।' কিন্তু শেষপর্যন্ত বিজ্ঞানেরই জয় হয়েছে- সত্যকে চাপা দিয়ে রাখা যায় নি ।

রক্ষণশীল বনাম প্রগতিশীল - এই দ্বন্দ্বে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা, বিজ্ঞানীদের জ্ঞান সাধনা থেমে থাকেনি শত প্রতিকূলতার মাঝেও । চার্বাক ও লোকায়ত দর্শনকে হত্যা করা হলেও ভারতে পুনর্বার বস্তুবাদী সাংখ্য দর্শনের জন্ম হয়েছে, জন্ম নিয়েছে নাস্তিক্যবাদ, অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism) ও বুদ্ধের ডাই-ইরেকটিক (অস্তি-নস্তি) দর্শন ।

বিজ্ঞান এভাবেই অগ্রসর হয় সত্যকে আবিষ্কারের আগ্রহ নিয়ে, নতুন সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে । কিন্তু বিজ্ঞানের পথ হল যুক্তির পথ, যৌক্তিকতার পথ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ । গণিত আর জ্যামিতির তীক্ষ্ণ যুক্তি তার ভিত- তার ভাষা, পর্যবেক্ষণ তার উপলব্ধি- সম্ভাব্য জ্ঞানের আকর, সংশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা তার অস্ত্র । তাই যুক্তিভিত্তিক সমাজ গড়তে হলে, সমাজ-প্রগতির পথে অগ্রসর হতে হলে, উদারনৈতিক বহুমাত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়তে হলে, বিজ্ঞান পড়তে হবে, বিজ্ঞানের চর্চা করতে হবে– বিজ্ঞানী না হয়েও বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মর্মবাণীগুলোকে ধাতস্থ করতে হবে, অনুধাবন করতে হবে– তবেই না আমরা লোকায়তবাদী আরজ আলী মাতুব্বরের জীবন দর্শন, তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা, সর্বোপরি এই মানবতাবাদী মানুষটির অন্তর্নিহিত বাণীকে বুঝতে পারব ।

চিত্র : আরজ আলী মাতুব্বর

আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি বিজ্ঞানের অবদান অর্থনৈতিক ব্যবধান সৃষ্টি করে মানুষে-মানুষে । বিজ্ঞান যদি দূরবর্তী আগন্তুক রূপে অশিক্ষিত সমাজে প্রবেশ করে, যেমনটি আমাদের সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে তাহলে আমরা তার বাহ্যিক স্থূল অবদানকেই ব্যবহার করব, এর অন্তর্নিহিত দর্শন ও বাণীকে আত্মস্থ করতে পারব না, ফলে সমাজের অগ্রগতি হবে না, পিছিয়েই থাকবে । অর্থাৎ সুইচ টিপে বৈদ্যুতিক বাতির আলো ব্যবহার করব ঠিকই, কিন্তু জানব না কী করে বৈদ্যুতিক বাতি আলো দেয় । ফলে আমাদের অন্তর্লোক অন্ধকারেই থাকবে আলোকিত হবে না । আরজ আলী মাতুব্বর বিদ্যুৎশক্তির পরিচয় জানতে চেয়েছেন শুধু তত্ত্বগত বই পড়ে নয়, বাতি জ্বালাবার জন্য গ্রামীণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডাইনামো বানিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করেছিলেন । দর্শন মাথায় থাকে, আর বিজ্ঞান মস্তিষ্ক থেকে নেমে আসে মাঠে– সাধারণ মানুষের কল্যাণে । আরজ আলী এইটি আমাদের দেখিয়েছেন, এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, এখানেই তিনি আমাদের নমস্য ।

লৌকিক দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনের মূল কথা হল জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নের মধ্য দিয়ে সত্যে উপনীত হওয়া যায়, তাই তো তিনি বলেন, 'অজানাকে জানার স্পৃহা মানুষের চিরন্তন । .. এই রকম 'কী' ও 'কেন' অনুসন্ধান করিতে করিতেই মানুষ আজ গড়িয়া তুলিয়াছে

বিজ্ঞানের অটল সৌধ।' অথচ ধর্মীয়পুস্তকগুলো আমাদের বিধি-নিষেধের গণ্ডীতে আবদ্ধ রেখে জ্ঞানের স্পৃহাটিকে মেরে ফেলতে চায়। ধর্মপুস্তকে যা বলা হয়েছে তাই চরম সত্য ও পরম জ্ঞান– এর বাইরে জানার কোনো প্রয়োজন নেই কেননা তা সত্য নয়, প্রকৃত জ্ঞান নয়। আরজ আলী এই ধর্মীয়গোঁড়ামি আর অন্ধবিশ্বাস থেকে আমাদের মুক্তির পথ বাৎলিয়েছেন। এই পথ দেখানোর আলো তিনি উপহার দিয়েছেন তার প্রথম গ্রন্থ 'সত্যের সন্ধানে'র মধ্য দিয়ে। জাতির কাছে তার শ্রেষ্ঠ উপহার। সত্যের সন্ধানকে তিনি বলেছেন 'লৌকিক দর্শন'- এর অর্থ জনগণের দর্শন, ইহলোকের দর্শন। বহুশতাব্দী আগে চার্বাক ও বৃহস্পতি ইহলৌকিক বা বস্তুবাদী দর্শনের নাম দিয়েছিলেন 'লোকায়ত দর্শন'। মাতুব্বর একবিংশ শতকের দ্বার প্রান্তে এসে আমাদের জন্য নতুন করে উপহার দিলেন নতুন কলেবরে 'লোকায়ত দর্শন'। তিনি বিজ্ঞানের সারকথা সরল ভাষায় চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন, আর এর মধ্য দিয়ে ভাববাদী দর্শনের গোড়ায় আঘাত করেছেন, "মানুষের মনে জিজ্ঞাসার অন্ত নাই। .. বর্তমান যুগটি বিজ্ঞানের যুগ এবং যুক্তিবাদেরও। বিজ্ঞান পৃথিবীর বুকে আত্মশক্তি বা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, কাহারও অনুকম্পায় নয়। ... আপনি যদি বিজ্ঞানের দান গ্রহণ করিতে না চাহেন, তাহা হইলে যানবাহন বিদেশ সফর ও জামা-কাপড় ত্যাগ করুন এবং কাগজ-কলমের ব্যবহার ও পুস্তক পড়া ত্যাগ করিয়া মুখস্ত শিক্ষা করুন। ইহার কোনটি করা আপনার পক্ষে সম্ভব ? ... মানুষ বিজ্ঞানের কাছে ঋণী। কিন্তু সমাজে এমন এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা হাতে ঘড়ি ও চক্ষে চশমা আঁটিয়া মাইকে বক্তৃতা করেন আর বস্তুবাদ বলিয়া বিজ্ঞানকে ঘৃণা ও বস্তুবাদী বলিয়া বিজ্ঞানীদের অবজ্ঞা করেন। অথচ তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, ভাববাদীরা বস্তুবাদীদের পোষ্য। বিজ্ঞান মানুষকে পালন করে। কিন্তু ধর্ম মানুষকে পালন করে না, বরং মানুষ ধর্মকে পালন করে এবং প্রতিপালনও। কোনো রকম গোঁড়ামীকে প্রশ্রয় না দিয়ে প্রত্যেক ধর্মকে যথাসম্ভব কুসংস্কার মুক্ত করা উচিত। কুসংস্কার ত্যাগ করার অর্থ 'ধর্মকে ত্যাগ করা' নহে। যদি কেহ কুসংস্কার ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হন এবং বলিতে চাহেন যে, কুসংস্কার ত্যাগ করিলে ধর্ম থাকিবে না, তাহা হইলে মনে আসিতে পারে যে, ধর্মরাজ্যে কি কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নাই? .. .. আমাদের অভিযান শুধু অসত্য বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, কোন ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। প্রত্যেকটি ধর্ম থাকিবে মিথ্যার আবর্জনাবর্জিত ও পবিত্র সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।"- এই অর্থে আরজ আলী আজকের যুগের রামমোহন, বিদ্যাসাগর। আমাদের নমস্য।

এই নতুন কথা লিখতে গিয়ে, চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে তাঁকে পাকিস্তানি স্বৈরশাসক ও রক্ষণশীল মৌলবাদীদের হাতে নিগৃহীত হতে হয়েছিল, নাস্তিকতা প্রচারের অভিযোগে সরকারের হাতে কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ায় তিনি মৌলবাদীদের হাত থেকে রক্ষা পান। মুক্তিযুদ্ধের পরপরই সত্যের সন্ধানের প্রকাশ সম্ভব হয়, নইলে এই দার্শনিককে হয়তো আর খুঁজে পাওয়া যেত না। শত অত্যাচারের মুখেও তিনি আত্মসমর্পন করেননি, নিজের মতবাদকে বিসর্জন দেননি। তিনি এ যুগের ব্রুনো, যিনি ব্রুনোর আদর্শকে আর একবার তুলে ধরলেন। তিনি আমাদের চির নমস্য।

ঈশ্বরই কি সৃষ্টির আদি বা প্রথম কারণ?

অভিজিৎ রায়

বার্ট্রান্ড রাসেল তার বিখ্যাত `why i am not a Christian' প্রবন্ধে প্রথম কারণ সম্বন্ধে বলেন :

> 'আমাদের আগেই বুঝে রাখা দরকার যে জগতের যা কিছু আমরা দেখতে পাই, সব কিছুর একটি কারণ আছে। এই কারণকে প্রশ্ন করতে করতে আপনি পেছনের দিকে এগিয়ে গিয়ে অবশ্যই প্রথম কারণের (First Cause) সম্মুখীন হবেন এবং এই প্রথম কারণকেই স্বতঃসিদ্ধভাবে 'ঈশ্বর' হিসেবে ধরে নেয়া হয়। ... আমিও বহুদিন ধরেই এটিকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলাম কিন্তু একদিন, যখন আমার বয়স আঠারো, আমি জন স্টুয়ার্ট মিলের আত্মজীবনী পড়ছিলাম, আর পড়তে গিয়েই সেখানে এই বাক্যটি পেলাম : 'আমার বাবা আমাকে প্রশ্ন করলেন–'কে আমাকে তৈরি করেছে?' আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। কিন্তু এই প্রশ্নটি আমাকে আরও একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের দিকে ঠেলে দিল। যেটি হল ঈশ্বরই যদি আমাকে তৈরি করে থাকেন, তবে ঈশ্বরকে তৈরি করেছে কে?' আমি এখনও মনে করি 'ঈশ্বরকে তৈরি করেছে কে?' এই সহজ সরল বাক্যটি প্রথম কারণ সম্পর্কিত যুক্তির দোষটি সেই প্রথম আমাকে দেখালো। যদি প্রতিটি জিনিসের একটি কারণ থাকে, তবে ঈশ্বরেরও কারণ থাকতে হবে। আবার যদি কারণ ছাড়াই কোন কিছু থাকতে পারে (যেমন ঈশ্বর), তবে এই যুক্তি ঈশ্বরের জগতের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য'

'বিগ ব্যাং' তত্ত্বটি বৈজ্ঞানিক সমাজে গৃহীত হওয়ার পর পরই বিশ্বাসীদের মধ্যে নতুন করে 'প্রথম কারণ'টিকে প্রতিষ্ঠা করার নব উদ্দীপনা লক্ষ করা গেল। ১৯৫১ সালে Pope Pius XII পন্টিফিকাল একাডেমির সভায় বলেই বসলেন–

> 'যদি সৃষ্টির শুরু থাকে, তবে অবশ্যই এই সৃষ্টির একজন স্রষ্টাও রয়েছে, আর সেই স্রষ্টাই হলেন ঈশ্বর।'

জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং ধর্মযাজক জর্জ হেনরি লেমিত্রি (যিনি 'বিগ ব্যাং' প্রতিভাসের একজন অন্যতম প্রবক্তা)– পোপকে বিনয়ের সঙ্গে এ ধরনের যুক্তিকে 'অভ্রান্ত' হিসেবে প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ইদানীংকালে 'কালাম কসমলজিকাল আর্গুমেন্ট' (Kalam Cosmological Argument) নামে একটি দার্শনিক যুক্তিমালা সাধারণ বিশ্বাসীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত সুদর্শন দার্শনিক এবং পেশাদার বিতার্কিক উইলিয়াম লেন ক্রেইগ (William Lane Craig) ১৯৭৯ সালে লেখা The Kalam Cosmological Argument বইয়ের মাধ্যমে যুক্তির এই ধারাকে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলেন। ধারাটিকে নিচের চারটি ধাপের সাহায্যে বর্ণনা করা যায় :

১. যার শুরু আছে, তার পেছনে একটি কারণ রয়েছে।
২. আমাদের আজকের এই মহাবিশ্বের একটি উৎপত্তি আছে।
৩. সুতরাং এই মহাবিশ্বের পেছনে একটি কারণ আছে।
৪. সেই কারণটিই হল 'ঈশ্বর'।

দার্শনিকেরা কালামের যুক্তিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন বিভিন্ন সময়েই।[১] এখানে 'বাহুল্য বিধায়' সেগুলোর পুনরুল্লেখ করা হল না। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার উল্লেখ না করলেই বোধ হয় নয়। সবকিছুর পেছনেই 'কারণ' আছে বলে পেছাতে পেছাতে বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের কাছে গিয়ে হঠাৎ করেই থেমে যান। এ সময় আর তারা যেন কোন কারণ খুঁজে পান না। মহাবিশ্বের জটিলতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য যদি ঈশ্বর নামক একটি সত্তার আমদানি করতেই হয়, তবে সেই ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করার জন্য একই যুক্তিতে আরেকটি 'ঈশ্বর'কে কারণ হিসেবে আমদানি করা উচিৎ। এভাবে আমদানির খেলা চলতেই থাকবে একের পর এক, যা আমাদেরকে অসীমত্বের দিকে ঠেলে দেবে। এই ব্যাপারটি স্বাভাবিকভাবেই সকল বিশ্বাসীর কাছে আপত্তিকর। তাই তারা নিজেরাই 'সবকিছুর পেছনেই কারণ আছে' এই স্বতঃসিদ্ধের ব্যতিক্রম হিসেবে ঈশ্বরকে কল্পনা করে থাকেন আর সোচ্চার ঘোষণা করেন–'ঈশ্বরের অস্তিত্বের পেছনে কোনো কারণের প্রয়োজন নেই।' সমস্যা হল যে, এই ব্যতিক্রমটি কেন শুধু ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে কেন নয়, এর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা তারা দিতে পারেন না।

দর্শন ছেড়ে এবার বিজ্ঞানের দিকে চোখ ফেরানো যাক। 'যার শুরু আছে তার পেছনে কারণ থাকতেই হবে'–কালামের যুক্তিমালার প্রাথমিক ধাপটিকে বিজ্ঞানের জগতে অনেক আগেই খণ্ডন করা হয়েছে। কারণবিহীন কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের উদাহরণ হাজির করে। আণবিক পরিবৃত্তি (Atomic Transition), আণবিক নিউক্লিয়াসের তেজস্ক্রিয় অবক্ষয়ের Radio Active Decay of nuclei) মতো কোয়ান্টাম ঘটনাসমূহ 'কারণবিহীন ঘটনা' হিসেবে ইতোমধ্যেই বৈজ্ঞানিক সমাজে স্বীকৃত। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্ব (uncertainty principle) অনুযায়ী

সামান্য সময়ের জন্য শক্তি (যা $E=mc^2$ সূত্রের মাধ্যমে, শক্তি ও ভরের সমতুল্যতা প্রকাশ করে) উৎপন্ন ও বিনাশ ঘটতে পারে–স্বতঃস্ফূর্তভাবে–কোনো কারণ ছাড়াই। এইসবই পরীক্ষিত সত্য। কাজেই উপরের উদাহরণগুলোই কালামের যুক্তিকে খণ্ডন করার জন্য যথেষ্ট।

আমি আমার লেখা 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' বইটিতে (মূল বইয়ের সপ্তম অধ্যায় দেখুন) তথাকথিত শূন্য থেকে কিভাবে জড় কণিকা সৃষ্টি হয়, তা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। এই ধারণাটিকে সম্প্রসারিত করে বহু বিজ্ঞানীই আজ মনে করেন এক কারণবিহীন কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের (Quantum Flactuation) মধ্য দিয়ে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হতে পারে, যা পরবর্তীতে সৃষ্ট মহাবিশ্বকে স্ফীতির (Inflation) দিকে ঠেলে দিয়েছে, এবং আরো পরে পদার্থ আর কাঠামো তৈরির পথ সুগম করেছে। এগুলো কোন কল্পকাহিনী নয়। মহাবিশ্ব যে শূন্য থেকে উৎপন্ন হতে পারে প্রথম এ ধারণাটি ব্যক্ত করেছিলেন এডওয়ার্ড ট্রিয়ন ১৯৭৩ সালে 'নেচার' নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জার্নালে।[২] তারপর আশির দশকে স্ফীতিতত্ত্বের আবির্ভাবের পর থেকেই বহু বিজ্ঞানী প্রাথমিক কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনরে ধারণাকে স্ফীতিতত্ত্বের সাথে জুড়ে দিয়ে মডেল বা প্রতিরূপ নির্মাণ করেছেন। শূন্য থেকে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির ধারণা যদি অবৈজ্ঞানিক এবং ভ্রান্তই হত, তবে সেগুলো প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক সাময়িকী (Scientific Journal) গুলোতে কখনই প্রকাশিত হত না। মূলত স্ফীতিতত্ত্বকে সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং সবগুলোতেই এই তত্ত্ব অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়েছে।[৩]

চিত্র : আঁদ্রেলিন্দে (বায়ে) এবং এলান গুথ (ডানে); স্ফীতিতত্ত্বের দুই প্রাণপুরুষ

আসলে ইনফ্লেশন বা স্ফীতি নিয়ে আঁদ্রে লিন্ডে আর তার দলবলের সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে সত্যিকার অর্থেই সেই 'উত্তপ্ত বিগ ব্যাং'–যার মাধ্যমে পনের'শ কোটি বছর আগে এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এ মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, তাকে বিদায় জানানোর সময় এসে গিয়েছে। কারণ, সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, বিগ ব্যাং দিয়ে মহাবিশ্বের শুরু নয়, বরং মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে ইনফ্লেশন দিয়ে। অর্থাৎ বিগ ব্যাং এর পরে ইনফ্লেশনের মাধ্যমে মহাবিশ্ব তৈরী (যা কিছুদিন আগেও সত্যি বলে ভাবা হত) হয়নি, বরং ইনফ্লেশনের ফলশ্রুতিতেই কিন্তু বিগ ব্যাং হয়েছে, তারপর সৃষ্ট হয়েছে আমাদের মহাবিশ্ব। তার কথায় :[৪]

> Inflation is not a part of big-bang theory as we thought 15 years ago. On the contrary, the big-bang is the part of inflationary model

আরও মজার ব্যাপার হলো, ওই ইনফ্লেশনের ফলে শুধু যে একবারই বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ ঘটেছে তা কিন্তু নয়, এরকম বিগ ব্যাং কিন্তু হাজার হাজার কোটি কোটি এমনকি অসীম-সংখ্যকবার ঘটতে পারে; তৈরী হতে পারে অসংখ্য 'পকেট মহাবিশ্ব'। আমরা সম্ভবত এমনই একটি পকেট মহাবিশ্বে অবস্থান করছি বাকিগুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত না হয়ে (এ ব্যাপারটিকে বলা হয় 'মাল্টিভার্স বা অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা[৫])। নিচের ছবিটি দেখলে লিন্ডের সাম্প্রতিক স্ফীতি তত্ত্বটি (যেটির নাম করণ করা হয়েছে Chaotic inflation) কি বলতে চাইছে এ সম্বন্ধে হয়ত কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে।

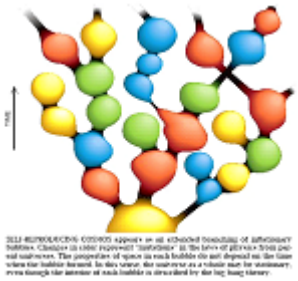

দেখা যাচ্ছে, এ তত্ত্ব অনুযায়ী কেওটিক ইনফ্লেশনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য সম্প্রসারিত বুদ্বুদ (expanding Bubbles) এবং প্রতিটি সম্প্রসারিত বুদ্বুদই আবার জন্ম দিয়েছে এক একটি 'বিগ ব্যাং'-এর। আর সেই এক একটি বিগ-ব্যাং পরিশেষে জন্ম দিয়েছে এক একটি পকেট মহাবিশ্বের। আমরা এ ধরনেরই একটি পকেট মহাবিশ্বে বাস করছি। এ তত্ত্ব আজ অনেকের মাঝেই তৈরি করেছে 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা' এক সর্বজনীন দার্শনিক আবেদনের, এ মহাবিশ্ব যদি কোনো দিন ধ্বংস হয়ে যায়ও, জীবনের মূল সত্তা হয়ত টিকে থাকবে অন্য কোনো মহাবিশ্বে, হয়ত অন্য কোনো ভাবে, অন্য কোন পরিসরে।

লিন্ডের মতে এ তত্ত্বের সমাধানটি এতটাই সরল যে, এর আগে এটি বিজ্ঞানীদের মাথায় কেন আসে নি, তা ভেবে লিন্ডে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। অ্যালেন গুথ যাকে 'ইনফ্লেশন তত্ত্বের জনক' হিসেবে অভিহিত করা হয়, তিনি তার দ্য ইনফ্লেশনারি ইউনিভার্স বইয়ে বিশ্বসৃষ্টিকে একটি 'আলটিমেট ফ্রি লাঞ্চ' হিসেবে অভিহিত করে বলেন :

> `Most Important of all, the Question of the Origin of the matter in the Universe is no longer thought to be beyond of science. ...If inflation is correct, then the inflationary mechanism is responsible for creation of essentially all the matter and energy in the Universe. ...After two thousand years of scientific research, it now seems likely that Lucretius (who said `Nothing can be created from nothing') was wrong Conceivably, everything can be created from nothing. And `everything' might include a lot more than what we can see. In the context of inflationary cosmology, it is fair to say that Universe is the ultimate free lunch!'

অনেক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকেরাই মনে করেন, কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের ধারণার সাথে সমন্বিত করা ইনফ্লেশন তত্ত্ব যখন একেবারে শূন্য থেকে বিশ্বসৃষ্টির একটি প্রাকৃতিক এবং যৌক্তিক সমাধান দিতে পারছে, তখন ঈশ্বর সম্ভবত একটি 'বাড়তি হাইপোথিসিস' ছাড়া আর কিছু নয়।

তারপরও একটি কথা বলা যায়, বিজ্ঞান কিন্তু কোনো বিষয় সম্পর্কে পরম বা নিখুঁত জ্ঞান দিতে পারে না। আজকে আণবিক স্থানান্তর, নিউক্লিয়াসের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বা কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মত ঘটনার কারণ পাওয়া যাচ্ছে না, ভবিষ্যতে পাওয়া যেতেই পারে। কেউই সে সম্ভাবনাকে অস্বীকার করছে না। ভবিষ্যতে পাওয়া যেতে পারে মহাবিশ্ব সৃষ্টির 'আদি' কারণও। কিন্তু সেই কারণটি যে 'ঈশ্বরের মত মহাপরাক্রমশালী 'সত্তা'ই হতে হবে, এটি ভেবে নেওয়ার কোন যৌক্তিক কারণ নেই, বরং কারণটি হতে পারে সম্পূর্ণভাবেই 'প্রাকৃতিক'। ওয়েস মরিসন তার `Must the Begining of the Universe Have a Personal Cause? A critical Examination of the Kalam's Cosmological Argument' এ বলেন–

> 'সৃষ্টির সব কিছুর পেছনেই কারণ আছে–এ ব্যাপারটি ধ্রুব সত্য নয়। আর যদিও বা ইতিহাসের পরিক্রমায় কখনও বের হয়ে আসে যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে একটি 'আদি' কারণ রয়েছেই, তবুও একথা ভেবে নেওয়ার কারণ নেই যে, সেই আদি কারণটি 'ঈশ্বরের মত একটি ব্যক্তি সত্ত্বাই হতে হবে।'

মুক্তমনা পদার্থবিদ ড. ভিক্টর স্টেংগরও একই ধরনের মত ব্যক্ত করে বলেন–

> `Note that even if Kalam Conclusion were sound and Universe has a cause, why could that cause itself not be natural? As it is, Kalam Argument fails both empirically and theoretically.'

টিকা :

১. উৎসাহী পাঠকেরা www.mukto-mona.com (World of science & rationalism page) এবং www.infidels.org. ওয়েব সাইট দুটি দেখতে পারেন।

২. Is the Universe a Vacuum Fluctuation? Edward P. Tryon, Nature, Vol. 246. pp369-397(1973)

৩. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন- The Inflationary Universe : The Quest for a New Theory of Cosmic Origins, Alan H. Guth, Perseus Books Group (March 1, 1998)

৪. Self Reproducing Inflationary Universe, Andrei Linde, Scientific American, 1998.

৫. মাল্টিভার্স নিয়ে মাসিক সায়েন্স ওয়ার্ল্ডের অক্টোবর এবং ডিসেম্বর '০৬ সংখ্যায় আমার দুটি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মানুষের বিবর্তন

বন্যা আহমেদ

ধরুন, দেড় দুই লক্ষ বছর আগে কোনো এক বুদ্ধিমান মহাজাগতিক প্রাণী, আমাদের কল্পনার সেই উড়ন্ত সসারে করে পৃথিবীতে পদার্পণ করল। সেই সময়ে আফ্রিকার এক কোণে ঘুরে বেড়ানো আমাদের আধুনিক মানুষের প্রজাতি *Homo sapiens* দের দেখে কী ভাবতো তারা? তারা কি বিবর্তনের পরিক্রমায় এই পৃথিবীতে আমাদের টিকে থাকা নিয়ে কোন বড়সড় বাজি ধরতে রাজি হত? তারা কি ভুলেও কল্পনা করতে পারতো যে এই প্রজাতিটিই খুব নিকট ভবিষ্যতে সারা পৃথিবীটাকে দখল করে নেবে? চারদিকের নির্মম প্রকৃতির সাথে টেক্কা দিয়ে টিকে থাকার জন্য কী আছে তাদের? প্রয়োজনীয় কিছুই নেই–থাবা নেই, ধারালো দাঁত নেই, শিং বা লোম কিছুই নেই, অত্যন্ত দুর্বল দেখতে অদ্ভুত এক দ্বিপদী প্রাণী! জানি, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর মতই শোনাচ্ছে, কিন্তু ব্যাপারটাকে ঠিক উড়িয়েও তো দেওয়া যায় না। এখন তাহলে প্রশ্ন করতে হয়, সে অবস্থা থেকে আমরা টিকে গেলাম কী করে?

শুধু টিকে গেছি বললেও তো ভুল বলা হবে–মাত্র দেড়-দুই লাখ বছরে ফুলে ফেপে সংখ্যা ছয়শো কোটি তো ছাড়িয়ে গেছিই, পৃথিবীব্যাপী প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করছি, ইদানীংকালে আবার পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে মহাবিশ্বের দিকেও দিয়েছি হাত বাড়িয়ে। কিন্তু কী করে সম্ভব হল সেটা? বৈচিত্র্যময় এই বিশাল প্রকৃতিতে আমরা কি আসলেই অনন্য? এর উত্তর তো সোজাসাপ্টা 'হ্যা' ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। মানুষ এই প্রকৃতিরই অংশ, অন্যান্য প্রাণীর মতই লাখ লাখ বছর ধরে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায়ই তার উৎপত্তি ঘটেছে। কিন্তু বিবর্তনের এই প্রক্রিয়াতেই মানুষের মধ্যে অনন্যসাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটেছে যা প্রকৃতিতে সেভাবে আগে কখনও ঘটেনি। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় যে কী ধরনের অভিনব এবং জটিল বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি ঘটতে পারে তারই সাক্ষ্য বহন করে চলেছি আমরা। বর্তমানে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক (তিনি এমআইটি'র মস্তিস্ক এবং বৌদ্ধিক বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক, ভাষা, ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ এবং তার সাথে বিবর্তনবাদের সম্পর্ক, মানুষের মন, সচেতন জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবষণার জন্য বিখ্যাত) স্টিভেন পিঙ্কার এক সাক্ষাৎকারে মজা করে বলেছিলেন, 'হুট করে দেখলে মানুষের বিবর্তনকে তো অসাধারণ বলেই মনে হয়। যে পদ্ধতি থেকে শামুক, বট গাছ বা মাছের মতো জীবের জন্ম হয় তা থেকেই কী করে আবার চাঁদে পৌঁছে যাওয়া, মহাসমুদ্র পাড়ি দেওয়া বা ইন্টারনেটের জন্মদাতা এমন এক বুদ্ধিমান প্রাণীর উৎপত্তি ঘটতে পারে? তাহলে কি কোন স্বর্গীয় স্পর্শ আমাদের মস্তিস্ককে বিশেষভাবে তৈরি করেছিল? না, আমি তা মনে করি না, কারণ ডারউইনের দেওয়া প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া দিয়েই মানুষের বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।'

মানুষের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে দু'টির কথা তো চোখ বন্ধ করেই বলা যায় : মানুষ একমাত্র প্রাণী যে দুই পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াতে শিখেছে, আর ওদিকে আবার খুব অসাধারণ রকমের বড় মস্তিস্কেরও বিবর্তন ঘটেছে যা অন্য কোন প্রাণীতে ঘটতে দেখা যায় নি। হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অত্যন্ত সুপরিচিত জীববিজ্ঞানী, এডওয়ার্ড উইলসনের গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০ লক্ষ বছর আগে থেকে শুরু করে আড়াই লাখ বছর আগে পর্যন্তও আমাদের মস্তিস্কের আকার প্রতি এক লাখ বছরে প্রায় এক চামচের সমান করে বেড়েছিলো।[1] বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ধীরগতিতে হলেও এখনও আমাদের মস্তিস্কের বিবর্ধন ঘটে চলেছে। আমাদের মস্তিস্কের যে অংশটি আমাদের বুদ্ধিমত্তার সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সেই সেরিব্রেল করটেক্স কে যদি টেনে ফ্ল্যাট করে বিছিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে যে তা চার পৃষ্ঠা জুড়ে জায়গা করে নিচ্ছে। আমাদের সবচেয়ে কাছের পূর্বসূরি শিম্পাঞ্জীদের সেরিব্রেল করটেক্স নেবে মাত্র এক পাতার সমান জায়গা, বানরেরটা নেবে একটি পোস্টকার্ডের সমান আর ইঁদুরের ক্ষেত্রে তা নেবে মাত্র একটা স্ট্যাম্পের সমান জায়গা।[২]

পার্থক্যটা চোখে পড়ার মতই, তাই হয়তো সাফল্যের পাল্লাটাও বেশ ভারী। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, উহু!, মস্তিস্কের আকারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও সেটাই বোধ হয় একমাত্র কারণ নয়! তাহলে তো আমাদের মত বড় মস্তিস্কের অধিকারী নিয়ান্ডারথাল প্রজাতির মানুষরাও একই রকম সাফল্য অর্জন করতে পারতো–তাদের মত প্রজাতির তো তাহলে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা নয়। একদিকে মস্তিস্কের বিকাশ, অন্যদিকে ঘটেছে ভাষার উৎপত্তি ও ব্যবহার, আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে ঘটেছে সাংস্কৃতিক বিবর্তন এবং বিকাশ ঘটেছে জটিল এক সামাজিক ব্যবস্থার। মানুষের বিবর্তনে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে যা হয়তো অন্য কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে সেভাবে প্রয়োজ্য নয়। এখানেই তো শেষ নয়, গত কয়েক লক্ষ বছরে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকা পরিবেশগত পরিবর্তনের ব্যাপারটাকেও তো এই সমীকরণ থেকে বাদ দিয়ে দিলে চলবে না। এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে টিকে থাকার জন্য মানুষ যত নতুন ভাবে অভিযোজিত হয়েছে বিবর্তনের নিয়মে ততই বিকশিত হয়েছে তার নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য।

আমরা জানি যে, এই মহাবিশ্ব প্রায় ১৪শ' কোটি বছর আগে সৃষ্টি হলেও আমাদের এই বুড়ো পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে প্রায় সাড়ে ৪শ' কোটি

বছর আগে। এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, প্রাণের জন্ম হতে লেগে গিয়েছিলো আরও প্রায় একশো কোটি বছর। আর মানুষের উৎপত্তি? সে তো সে দিনকার কথা! আদিম এককোষী প্রাণ, ব্যাকটেরিয়া, বহুকোষী প্রাণী, অ্যালজি, অমেরুদণ্ডী প্রাণী, বিভিন্ন মেরুদন্ডী প্রাণীর উৎপত্তি, বিকাশ বা বিলুপ্তির ধাপ বেয়ে, বিবর্তনের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে মানুষের আদি পূর্বপুরুষদের উদ্ভব ঘটলো মাত্র ৫০-৬০ লাখ বছর আগে। সে সময়ে মানুষ এবং অন্যান্য বনমানুষের মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কিছু প্রজাতিরা পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াত শিখলেও তার থেকে আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষদের উদ্ভব ঘটতে লেগে গেছে আরও প্রায় ৩০ লক্ষ বছর। আর আমাদের নিজেদের প্রজাতি অর্থাৎ *Homo Sapiens* দের গল্পের শুরু তো সেদিন, মাত্র দেড় দুই লাখ বছর আগে। ভূতাত্ত্বিক নিয়মে হিসাব করলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের ব্যাপারটা এক্কেবারেই আনকোরা। শুধু তো তাইই নয়, বিবর্তনের ধারায় যেমন অগুনতি জীবের উৎপত্তি ঘটেছে ঠিক তেমনি তাদের একটা বড় অংশ বিলুপ্তও হয়ে গেছে। একইভাবে আমরা ফসিল রেকর্ড থেকে দেখতে পাই যে, মানুষেরও বিভিন্ন প্রজাতির উৎপত্তি ঘটেছে, আবার আমাদের প্রজাতি ছাড়া বাকিরা বিলীন হয়ে গেছে ইতিহাসের পাতায়। বিবর্তনের ইতিহাসে অনিয়শ্চতার তো কোনো শেষ নেই, ডাইনোসরের মত অতিকায় প্রাণী বহুকাল ধরে পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করেও শেষপর্যন্ত হারিয়ে গেছে। সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে ভয়ঙ্কর কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মহাপরাক্রমশালী ডায়নোসরগুলো বিলুপ্ত হয়ে না গেলে সেই সময়ের অত্যন্ত নগন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলো হয়তো এত বিকশিত হতে পারতো না। অর্থাৎ, অন্যান্য প্রাণীর মতই আমাদের উদ্ভবও তো কোনো পূর্ব নির্ধারিত ব্যাপার নয়। প্রখ্যাত বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী এবং ফসিলবিদ স্টিফেন জে. গুলড তাই বলেছিলেন, 'মানুষ আগে থেকে নির্ধারিত বিবর্তনের কোন ধারার শেষ ফসল নয় বরং মানুষ হচ্ছে আকস্মিকভাবে উদ্ভুত মহাজাগতিক এক অনুচিন্তার ফলাফল। বিশাল শাখা প্রশাখাসহ যে প্রাণবৃক্ষের বিবর্তন ঘটেছে মানুষ হচ্ছে তার একটা ছোট্টো শাখামাত্র। এরকম নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, এই গাছের বীজটাকে যদি আবার নতুন করে বপন করা হয় তাহলে এই শাখাটা আবার একই রকমভাবে একই জায়গায় জন্ম নেবে না।'[৩]

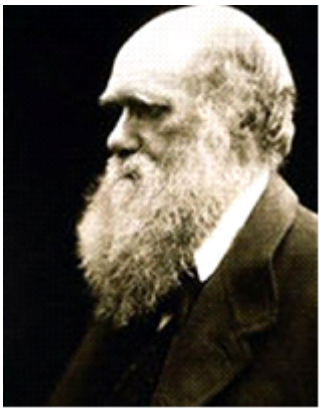

চিত্র : চার্লস ডারউইন

আমরা জানি যে, ষোড়শ শতাব্দীতে এসে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের ধারণাটা হাজার বছর ধরে টিকে থাকা মধ্যযুগীয় ধর্মীয় এবং সামাজিক স্থবিরতার ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপরও তো প্রায় কয়েকশ বছর লেগে গিয়েছিল সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে। আমরা জানি কিভাবে বহু বাঁধাবিঘ্ন পেরিয়ে জীববিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেরিয়ে এসেছিলো সেই 'প্রজাতির পৃথক পৃথক সৃষ্টি' এবং স্থির প্রজাতির মতবাদের ভ্রান্তি থেকে! প্রথমবারের মতো আমরা জানতে পেরেছিলাম আমাদের উৎপত্তি এবং বিকাশের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা। তারপর প্রায় দেড়শো বছর কেটে গেছে, বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক শাখাগুলো প্রতিদিনই আরও জোরালোভাবে এই বিবর্তন তত্ত্বের সঠিকতা প্রমাণ করে চলেছে, কিন্তু প্রাচীন চিন্তার অচলায়তন ভেঙে আমাদের সমাজে তা কিন্তু এখনও জায়গা করে নিতে পারেনি। পৃথিবীতে যে গুটিকয়েক তত্ত্ব সমস্ত পুরোনো ঘুণে ধরা রক্ষণশীল ভ্রান্ত চিন্তা ভাবনা ও প্রথাকে সমূলে আঘাত করেছে তার মধ্যে বিবর্তনবাদ অন্যতম। তাই তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধেরও মাত্রাটা যে একটু বাড়াবাড়ি রকমের বেশি হবে তা তো জানা কথাই। মানব সভ্যতার সমগ্র ইতিহাস জুড়েই আমরা এর পুনরাবৃত্তি দেখে এসেছি। অন্যান্য জীবের বিবর্তন নিয়ে কথা বললে যাও বা ঠিক আছে, কিন্তু মানুষের বিবর্তনের প্রসঙ্গ আসলেই আমাদের মাথায় যেনো আকাশ ভেঙে পড়ে। সেই ১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইন এবং অ্যালফ্রেড ওয়ালেস যখন প্রথম বিবর্তনের তত্ত্বটি প্রস্তাব করলেন তখন চার্চের বিশপের স্ত্রী মুখ থেকে যে আতঙ্কবাণী বের হয়ে এসেছিলো, তা যেনো আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। তিনি আর্তনাদ করে বলেছিলেন,[৪] 'বনমানুষ থেকে আমাদের বিবর্তন ঘটেছে! আশা করি যেনো এটা সত্যি না হয়, আর যদি তা একান্তই সত্য হয়ে থাকে তবে চলো আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি সাধারণ মানুষ যেনো এটা কখনই জানতে না পারে!' সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সত্যকে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা তো আর নতুন কিছুই নয়। এখনও বিশ্বব্যাপী সেই চেস্টার যেন কোনো কমতি নেই!

ডারউইন প্রথমে তার 'প্রজাতি উৎপত্তি' বইটিতে মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে তেমন কিছুই বলেন নি (শুধু বলেছিলেন, 'Light will be thrown on the origin of man and his history'); সেই সময়ের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার এই নিশ্চুপতার কারণটা বোঝা তেমন কঠিনও নয়। ১৮৫৭ সালে জার্মানির ডুসেল নদীর উপত্যকায় নিয়েন্ডারথাল নামক জায়গায় বেশ কিছু আদিম মানুষের করোটি আবিস্কৃত হয়।

তখন জার্মানির প্রখ্যাত অধ্যাপক স্কাফ হাউসেন ফসিলগুলো পর্যবেক্ষণ করে প্রস্তাব করেন যে, এগুলো আসলে মানুষের কোনো বিলুপ্ত আদিম প্রজাতির হাড়গোড়। এদের নাম দেওয়া হয় নিয়েন্ডারথাল মানুষ।[৫] তখনকার শিক্ষিত সমাজ কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করেননি। ওদিকে ডারউইনের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং বিজ্ঞানী টি এইচ হাক্সলি সে সময়ই মানুষের বিবর্তনের বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং এপ বা বন মানুষের সাথে মানুষের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যগুলো তুলে ধরে ১৮৬৩ সালে *`Evidence as to Man's Place in Nature'* নামক বইটি প্রকাশ করেন। এর পর ডারউইন যখন *`The Descent of man and selection with respect to Sex'* বইটি বের করেন ততদিনে মানুষের বিবর্তনের বিষয়টি বুদ্ধিজীবীমহলে মোটামুটিভাবে সুপরিচিত হয়ে গেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জার্মানি বিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেকেল তার বিখ্যাত 'সৃষ্টির ইতিহাস' বইয়ে লিখেছিলেন যে, বনমানুষ থেকে মানুষের বিবর্তন যদি সত্যিই ঘটে থাকে তবে মানুষও নয় আবার ঠিক বনমানুষও নয় এমন ধরণের মধ্যস্থিত ফসিল পাওয়া যাবে। তিনিই প্রথম বিবর্তনের মধ্যবর্তী অবস্থার এরকম ফসিলগুলোকে হারানো যোগসূত্র বা `missing link' বলে আখ্যায়িত করেন।[৬] তার কথাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে– গত একশো বছরে এমন অসংখ্য ফসিলের সন্ধান পাওয়া গেছে যা থেকে মানুষ এবং বনমানুষের মধ্যবর্তী অবস্থার বিবর্তনের ধাপগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শুধু তো তাইই নয়, এ থেকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন সময়ে আমাদের প্রজাতির *(Homo sapiens)* মানুষ ছাড়াও আরও অন্যান্য প্রজাতির মানুষও বিচরণ করেছে, এমনকি অনেক সময় একাধিক প্রজাতির মানুষ একই সময়ে তাদের সম্মিলিত পদচারণায় মুখরিত করে তুলেছে আমাদের এই ধরনী। এই মুহূর্তে আমরা ছাড়া আর কোনো মানব প্রজাতির অস্তিত্ব না থাকলেও অতীতে যে তা ছিলো তা নিয়ে কিন্তু দ্বিমত প্রকাশের কোনো অবকাশই আর নেই।

গত একশ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা মানুষ এবং এপের মধ্যবর্তী স্তরের যে সমস্ত ফসিল খুঁজে পেয়েছেন তা থেকে মানব বিবর্তনের একটা পরিস্কার চিত্র পাওয়া কিন্তু আর কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। এখন সমস্যাটা আর 'যথেষ্ট পরিমাণে ফসিল পাওয়া যাচ্ছে না' তা নয় বরং ঠিক তার উলটো। এত রকমের মানুষের পূর্বপুরুষের প্রজাতির এবং তাদের মধ্যবর্তী স্তরের ফসিল পাওয়া যাচ্ছে যে তাদেরকে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঠিক ঠাক মত শ্রেণীবিন্যাস করাটাই বিজ্ঞানীদের জন্য এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেকেলের মনোবাঞ্ছা যে এভাবে পূরণ হবে তা হয়তো তিনি নিজেও আশা করেননি। তার ওপরে আবার গত কয়েক দশকে ডেটিং পদ্ধতির যে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে তার ফলে ঠিকভাবে ফসিলের বয়স এবং প্রকৃতি নির্ধারণ করার ক্ষমতাও বেড়ে গেছে বহুগুণ।

এছাড়া মানুষ এবং এপের দৈহিক গঠনের তুলনামূলক বিচার থেকেও বহু তথ্য বেরিয়ে এসেছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের সাথে এপের পার্থক্যগুলো যত বেশি না পরিমাণগত, তার চেয়ে অনেক বেশি গুণগত। মানুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রকমের ভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের আকার বিশেষত মস্তিস্কের আকার মানুষের অনেক বড়, বন মানুষের সাথে তাদের হাত এবং পায়ের আকারের অনুপাতেও পার্থক্য রয়েছে, গায়ের লোম পড়ে গেছে অনেকাংশেই, চামড়ার রঞ্জকবস্তু এবং বুড়ো আঙুল নাড়াবার ক্ষমতাও মানুষের অনেক বেশি। আগে মানুষের সাথে বনমানুষের পার্থক্যকে যত বড় বলে মনে করা হত আধুনিক গবেষণার ফলে তা ক্রমশঃ যেন কমে আসছে। অনেকেই এখনও ব্রিটিশ বিজ্ঞানী রিচার্ড ওয়েন (Richard Owen, 1804-1892) এর বলা কিছু ভুল তথ্যকে সত্য বলে মনে করে বসে আছেন– ওয়েন মনে করেছিলেন যে, তিনি মানুষ এবং বনমানুষের মধ্যে বিশাল এক পার্থক্য খুঁজে পেয়েছেন যা দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে মানুষ এবং বনমানুষ একই পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে আসেনি। তিনি বলেন মানুষের মস্তিস্কে হিপোক্যাম্পাস নামের একটি বাড়তি উপাঙ্গ রয়েছে যা কি না বনমানুষের মধ্যে নেই। কিন্তু ডারউইনের বন্ধু টি এইচ হাক্সলি তখনই তা ভুল প্রমাণ করেন, প্রকৃতপক্ষে মানুষ এবং এপ দুই গ্রুপের মধ্যে এই উপাংগটির অস্তিত্ব রয়েছে।

এতো গেলো একটা দিক, অন্যদিকে জেনেটিক্স এবং জিনোমিক্সের আধুনিক গবেষণা এবং পর্যালোচনাকে বাদ দিলে তো বিবর্তনের গল্প বলাই এখন আর সম্ভব নয়। গত দুই তিন দশকে বিজ্ঞানের এই শাখাটি বিবর্তনবাদ এবং মানুষের বিবর্তনের পক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী সব তথ্য এবং সাক্ষ্য হাজির করেছে যার সাথে অঙ্গস্থানবিদ্যা এবং ফসিলবিদ্যা থেকে আলাদা আলাদাভাবে পাওয়া তথ্যগুলো প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে। আর দুএক জায়গায় যেখানে অমিল বা সংশয় ধরা পড়ছে সেখানে বিজ্ঞানীরা সুযোগ পাচ্ছেন আরও নতুন নতুন গবেষণার মাধ্যমে ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার। বিজ্ঞানের তিনটি শাখা থেকে স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া এই সম্মিলিত তথ্যগুলো বিবর্তনবিদ্যাকে অত্যন্ত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। গত কয়েক দশকে আণবিক জীববিদ্যা, জেনেটিক্স, জিনোমিক্সের বিভিন্ন আবিস্কারগুলো প্রাণের বিবর্তন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে এক নতুন পর্যায়ে উত্তোরিত করেছে। চলুন খুব সক্ষেপে দেখা যাক আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় আমাদের নিজেদের বিবর্তনের গল্পটা এখন কীরকম শোনাচ্ছে।

বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স তার `Unweaving the Rainbow' বইতে বলেছিলেন যে, ডিএনএ হচ্ছে 'মৃতের জেনেটিক বই'–আমাদের পূর্বপুরুষের ইতিহাসের রোজনামচা যেন তারা। বিবর্তনবিদ্যা বলে যে, জীবের শরীরের সবকিছুই তার পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। আর এদিকে ডিএনএ'র মধ্যে বিস্তারিতভাবে লেখা রয়েছে সেই কাহিনীর পূর্ণ ধারাবাহিক বিবরণী–কখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা

কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে, কোন পরিবেশে টিকে থাকার জন্য যুদ্ধ করেছে, প্রজননের ইতিহাস থেকে শুরু করে কোথায় কখন কোন মিউটেশন তাদের বিবর্তনের গতিকে নিয়ে গেছে নতুন দিগন্তে–সবকিছু লেখা আছে আমাদের ডিএনএ-র ভিতরে। প্রজননের মাধ্যমে পরের প্রজন্ম তৈরির ধারাবাহিকতা যদি ছিন্ন না হয় তাহলে ডিএনএ-এর ভিতরে লেখা তথ্যগুলো এক অণু থেকে আরেক অণুতে, এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। প্রতিটি জীব তার দেহকোষের ভিতরে হাজার লক্ষ এমনকি কোটি বছর ধরে এই ঐতিহাসিক তথ্য বয়ে বেড়াচ্ছে। আমরা মোটে গত কয়েক দশক ধরে আণবিক জীববিদ্যার প্রভূত অগ্রগতিরে ফলে সঠিকভাবে ডিএনএর ভিতরে লেখা এই তথ্যগুলো পড়তে এবং বুঝতে শুরু করেছি। ড. রিচার্ড ডকিন্স মনে করেন যে পৃথিবীতে যদি একটাও ফসিলের অস্তিত্ব না থাকতো, বা কেউ যদি তাদেরকে কোন ম্যাজিক করে উড়িয়ে দিত, তাহলেও পৃথিবী জোড়া জীবের বিস্তৃতির প্যাটার্ণ এবং তাদের জেনেটিক তথ্য থেকেই সম্পূর্ণ বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করা সম্ভব হতো।[৭] কথাটা শুনতে অতিরঞ্জণ বা ঔদ্ধত্য বলে মনে হলেও, আজকে একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় দাঁড়িয়ে, আণবিক জীববিদ্যার সাম্প্রতিক আবিস্কারগুলোকে একটু মনযোগ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেই বোঝা যায় যে, কথাটা আদৌ মিথ্যা নয়।

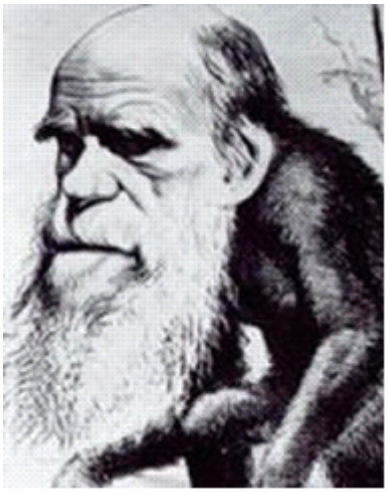

মানুষের জিনোমের সিকোয়েন্সিং বা অনুক্রমের ঐতিহাসিক প্রথম খসড়াটি প্রকাশিত হয় ২০০১ সালের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা এই প্রজেক্টে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৩ সালে এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়।[৮] এর কিছুদিন পরেই, ২০০৫ সালে, আমাদের বিবর্তনের ইতিহাসে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় শিম্পাঞ্জির জিনোমও পড়ে শেষ করা হয়। (এদিকে আবার গত কয়েক বছরে ইঁদুর, মৌমাছি, ইস্টসহ বেশ কয়েকটি জীবের জিনোমের অনুক্রমও বের করা হয়েছে, www.ncbi.nih.gov/Genbank বা www.genome.ucsc.edu ওয়েব সাইটগুলোতে এখন মানুষ এবং শিম্পাঞ্জিসহ বিভিন্ন জীবের জিনোমের অনুক্রমের বিস্তারিত তথ্য রাখা আছে)।[৯] পৃথিবী জোড়া ৬৭ জন বিজ্ঞানী এই শিম্পাঞ্জি সিকোয়েন্সিং এ্যন্ড এ্যনালিসিস কনসোরটিয়ামে অংশগ্রহণ করেন, নেচার জার্নালের ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর ইস্যুতে মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির জিনোমের তুলনামুলক বিশ্লেষণের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হয়।[১০] ন্যাশনাল হিউম্যান জিনোম রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (NHGRI) এর ডিরেকটর ফ্রান্সিস কলিন্স এর মতে, এটি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস, শারীরিক গঠন, বিভিন্ন ধরনের অসুখ বিসুখের উৎপত্তি বুঝতে হলে বিবর্তনের ধারায় উদ্ভুত এবং অত্যন্ত কাছাকাছি সম্পর্কিত বিভিন্ন জীবের জিনোমের সাথে আমাদের জিনোমের তুলনামূলক ব্যাখ্যা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের জিনোমের পরীক্ষার সাথে ফসিল রেকর্ড এবং শারীরবিদ্যার তুলনামূলক ব্যাখ্যা থেকে বিজ্ঞানীরা আগে শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে যা ভেবেছিলেন তা প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে। এদের বর্তমান জিনোমের মধ্যে সাদৃশ্য প্রায় ৯৯% এবং তাদের প্রোটিনের গঠনও খুবই কাছাকাছি। ডিএনএ-র সন্নিবেশন (Insertion) এবং বিলুপ্তি (Deletion) হিসাব করলে এই সাদৃশ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৬%এ। প্রোটিন লেভেলে বিচার করলে দেখা যায় যে তাদের ২৯% জিন একই প্রোটিনের কোডিং এ নিয়োজিত। অর্থাৎ দুটো মানুষের ডিএনএ' তুলনা করলে যে পার্থক্য দেখা যাবে, একটা মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির মধ্যে সে পার্থক্যটা মাত্র ১০ গুণ বেশী, কিংবা ধরুন ইঁদুরের সাথে মানুষের যে পার্থক্য তার তুলনায় শিম্পাঞ্জির সাথে পার্থক্য ৬০গুণ কম![১১] বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন যে, মানুষ এবং শিম্পাঞ্জিতে কিছু কিছু জিন অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর তুলনায় ক্রমাগতভাবে দ্রুতগতিতে বদলে যাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে শব্দ শোনা এবং বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় জিন,

ায়ূতন্ত্রের সংকেত আদান-প্রদানের জিন, শুক্রাণু তেরির জিনসহ আরও কয়েকটি জিন। এদিকে আবার দেখা যাচ্ছে যে, বিবর্তনের ধারায় মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির ডিএনএ'তে ইঁদুর বা খরগোশের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে ক্ষতিকর মিউটেশন ঘটেছে। তার ফলে একদিকে যেমন তাদের অসুখের পরিমাণ বেড়েছে কিন্তু অন্যদিকে আবার তা তাদেরকে পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হতে বাড়তি সুবিধা করে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা মানুষের জিনোমের এই ধরনের মিউটেশনগুলো আরও খতিয়ে দেখছেন। শিম্পাঞ্জি, অন্যান্য প্রাইমেট বা অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর সাথে আমাদের মিলগুলো বোঝা যেমন দরকার ঠিক তেমনিভাবেই গুরুত্বপূর্ণ এদের সাথে আমাদের পার্থক্যগুলো সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারা। তাহলেই হয়তো আমরা বলতে পারবো কোন কোন পরিবর্তনগুলোর ফলে আমরা মানুষে বিবর্তিত হয়েছি, কিংবা ঠিক কোন কোন বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে আমরা তাদের থেকে বুদ্ধিমত্তায় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে এত আলাদা হয়ে গেছি। ইতোমধ্যেই আমরা এই ধরনের বিশ্লেষণ থেকে এমন কিছু কিছু তথ্য জানতে পেরেছি যা আমাদের স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে পারে। যেমন ধরুন, দেখা যাচ্ছে যে, শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের সাধারণ পূর্বসুরি থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর মানুষ Caspase-12 নামক জিনের কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে যার ফলেই সে এখন আলজাইমারস বা স্মৃতিভ্রংশ (Alzheimer's) রোগে আক্রান্ত হয়। এখন আমরা যদি শিম্পাঞ্জির মধ্যে এই জিনের কাজগুলোকে ঠিকমতো বুঝতে পেরে আমাদের শরীরে মধ্যে তার প্রয়োগ ঘটাতে পারি তাহলে হয়তো এই মারাত্মক রোগটির একটি স্থায়ী ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিভিন্ন রোগের সাথে আমাদের জেনেটিক গঠনের বিবর্তনের ইতিহাস যে কী ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তা এখন ধীরে ধীরে আমাদের সামনে পরিস্কার হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

গত শতাব্দীর প্রথম দিকে কিন্তু মানুষের তেমন কোন মধ্যবর্তী ফসিলের সন্ধান পাওয়া যায়নি, অনেকেই তখন মনে করতেন যে, মানুষ হয়তো অন্যান্য বনমানুষের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো প্রায় ৫ কোটি বছর আগে। তারপর ধীরে ধীরে যখন আরও অনেক ফসিল পাওয়া যেতে শুরু করলো, এদিকে আবার বিজ্ঞানীরা মানুষের সাথে ওরাং ওটাং, গরিলা, শিম্পাঞ্জির মিলগুলো আরও ভালো করে বুঝতে শুরু করলেন তখন মনে করা হয় যে, হয়তো দেড় কোটি বছর আগে মানুষের বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিলো। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডিএনএর আবিস্কারের পর আমাদের সামনে আণবিক জীববিদ্যার গবেষণার দুয়ার খুলে যায়। সত্তরের দশকে মানুষ এবং অন্যান্য বনমানুষের প্রোটিনের এমাইনো এসিডের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে, বিবর্তনের যাত্রায় মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির আলাদা হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা ৫০ লক্ষ বছরের বেশি পুরোনো হতে পারে না। এদিকে আবার গত তিরিশ, চল্লিশ বছরে ফসিলবিদেরা আফ্রিকা থেকে মানুষের 'আধা' এবং 'সম্পূর্ণ' আদিপুরুষদের যে সব ফসিল খুঁজে পেয়েছেন তা থেকেও কিন্তু আমরা এখন একই ধরণের তথ্য পেতে শুরু করেছি। আর এদিকে আজকের জিনোমিক্সের অত্যাধুনিক গবেষণা থেকেও আমরা এ বিষয়ে অত্যন্ত জোরালো সাক্ষ্য পেতে শুরু করেছি। ২০০৬ সালের মে মাসে এমআইটি এবং হার্ভার্ড ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানীরা নেচার জার্নালে যে গবেষণাটি প্রকাশ করেন তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষ এবং শিম্পাঞ্জি তাদের সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো ৫৪ লক্ষ থেকে ৬৩ লক্ষ বছর আগে এবং তাদের আলাদা হয়ে যাওয়ার ইতিহাসটি বেশ জটিল।[১২] বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সম্পূর্ণভাবে আলাদা হয়ে যাওয়ার আগে এই দুই প্রজাতি বা উপপ্রজাতির মধ্যে বেশ লম্বা সময় ধরে প্রজনন ঘটেছিল যা আমাদের ক্রোমোজোম x এর মধ্যে গভীর ছাপ ফেলে গেছে। কে জানে, এ জন্যই হয়তো আমরা এত লম্বা সময় ধরে আফ্রিকাজুড়ে 'না-বনমানুষ–না-মানুষ' জাতীয় মধ্যবর্তী মানুষের বা মিসিং লিঙ্কের সন্ধান পাচ্ছি!

একটা মজার গল্প দিয়ে লেখাটা শেষ করা যাক। শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাং ওটাং সবার মধ্যে ক্রোমোসোমের সংখ্যা ৪৮, হঠাৎ করেই দেখা যাচ্ছে যে, একই হোমিনয়ডিয়া দলের সদস্য হওয়া স্বত্ত্বেও, মানুষের ক্রোমোসোমের সংখ্যা হয়ে গেছে ৪৬। বিবর্তনের তত্ত্বানুযায়ী এরা যদি পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে থাকে এবং অন্যদের সবার মধ্যে ৪৮ টি ক্রোমোসোমের অস্তিত্ব থাকে, তাহলে অবশ্য আমাদেরকে এখন প্রশ্ন করতে হবে, মানুষের জিনোম থেকে দু'টো ক্রোমোজোম কোথায় হারিয়ে গেল? বিবর্তন তত্ত্ব যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে তো একদিন হঠাৎ করে ক্রোমোজোম দু'টো হাওয়া হয়ে যেতে পারে না, তাদের কোনো না কোনো রকমের চিহ্ন থাকতেই হবে মানুষের জিনোমের মধ্যে। আর যদি এ ধরণের কোন নমুনা একেবারেই না পাওয়া যায় তাহলে তো বিবর্তনবাদের মুল বিষয়টি নিয়েই সন্দেহের অবকাশ থেকে যাচ্ছে। জীববিদরা প্রকল্প দিলেন যে, যেহেতু সব বনমানুষের মধ্যে এখনও ৪৮টা ক্রোমোজোম আছে কিন্তু এদের দলের মধ্যে শুধুমাত্র মানুষেরই দু'টো ক্রোমোজোম কম আছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, শেষ সাধারণ পুর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর বিবর্তনের পথে চলতে চলতে কোন এক সময়ে মানুষের প্রজাতির মধ্যে আদি দু'টো ক্রোমোজোম সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল, যা অন্যান্য বনমানুষের ক্ষেত্রে ঘটেনি। শেষ পর্যন্ত, এই তো কিছুদিন আগে, ২০০২ সালে বিজ্ঞানীরা দেখালেন যে, আসলে শিম্পাঞ্জিদের যে ১২ এবং ১৩ নম্বর ক্রোমোজোম (এখন তাদেরকে 2A এবং2B বলে নামকরণ করা হয়েছে) রয়েছে সে দু'টো মানুষের মধ্যে মুখোমুখীভাবে সংযুক্ত হয়ে ক্রোমোজোম ২ তৈরি করেছে।[১৩] এই দু'টো ক্রোমোজোমের সংযুক্তির বিন্দুটির গঠন নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা থেকেও মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসের আরও অনক তথ্য বের হয়ে এসেছে, কিন্তু তা নিয়ে এখানে আর আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। আসলে এ ধরনের ক্ষেত্রগুলোতেই আমরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে বিবর্তনবাদের শক্তি এবং সঠিকতা বুঝতে পারি। কোন সঠিক তত্ত্ব থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বা পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয় যা অবৈজ্ঞানিক কোনো কিছুর উপর ভিত্তি করে দেওয়া সম্ভব নয়। যেমন ধরুন, মানুষের শরীরে কোনভাবেই এই হারিয়ে যাওয়া ক্রোমোজোমটির অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়া যেত তাহলে বিবর্তন তত্ত্বের সঠিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হতেন বিজ্ঞানীমহল।

এছাড়াও মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির জিনোম বিশ্লেষণ থেকে বিজ্ঞানীরা মানুষের মস্তিস্কের অত্যন্ত দ্রুত বিকাশের জন্য দায়ী জিনগুলো, তাদের বিকাশের সময়সীমা, বিভিন্ন ধরনের প্রোটিনের গঠন, বনমানুষদের মধ্যে ঘ্রাণশক্তির লোপ এবং সেই সাথে সাথে শক্তিশালী দৃষ্টিশক্তির বিকাশের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য পেতে শুরু করেছেন। এমআইটি এবং হার্ভার্ড ইউনির্ভারসিটির ব্রড ইনস্টিটিউটের সদস্য বিজ্ঞানী টি মিকেলসনের মতে, আগামী কয়েক বছরে আরও অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং প্রাইমেটের জিনোমের অনুক্রম বের করে ফেলা যাবে, সেখান থেকে খুব সহজেই মানুষের বিবর্তনের জন্য দায়ী বিশেষ ডিএনএর অনুক্রমগুলো বেড়িয়ে পড়বে। মানুষের বিবর্তনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো, যেমন ধরুন, দুই পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে পারা, মস্তিস্কের বিবর্ধন বা জটিল ভাষাগত দক্ষতার মতো বিবর্তনের বিশেষ ধাপগুলোতে কী ধরনের জেনেটিক পরিবর্তন কাজ করেছিল সেগুলো আবিস্কার করতে পারলে হয়তো আমরা মানুষের বিবর্তনের একটা সম্পূর্ণ রূপরেখা তৈরি করতে পারবো।[১৪] আবার অন্য দিকে এই জেনেটিক পরিবর্তনগুলো তাদেরকে টিকে থাকার জন্য কি বিশেষ ধরনের সুবিধা করে দিয়েছিল–এগুলো কি তাদের পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বাড়তি সুবিধা করে দিয়েছিল নাকি দ্রুত চলাচলে বা পারস্পরিক সংযোগ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল, নাকি সামাজিকভাবে দলবদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকার ক্ষমতা যুগিয়েছিল-এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে রয়েছে আমাদের উৎপত্তি এবং বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাসের রহস্য।

তথ্যসূত্র

1. DiChristine M, 2006, Becoming Human, Scientific American Science Magazne:Special Edition, p.1.
2. Calvin W. 2006, The Emergence of Intelligence, Scientific American:Special Edition, pp 85.
3. Gould, S, J: Understanding Evolution, PBS Website : (http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/08/1/l_081_06.html
4. Skybreak, A. 2006, The Science of Evolution and The Myth Of Creationism, Insight Press, Illinois, USA.
5 .আখতারুজ্জামান, ম, ১৯৯৮, বিবর্তনবাদ, বাংলা একাডেমি, পৃষ্ঠা ৩১৯।
6. আখতারুজ্জামন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩২২।
7. Dawkins R, 2004, The Ancestor's Tale, 2004. Houghton Mifflin Company, Boston, New York.
8. The Human Genome Project, http://genome.wellcome.ac.uk/node30075.html
9. New Genome Comparison Finds Chimps, Humans Very Similar At DNA Level, 2005, Science Daily Magazine. http://www.sciencedaily.com/releases/2005/09/050901074102.htm
10. Ibid
11. Ibid
12. Human and Chimp Genomes Reveal New Twist on Origin of Species, 2006, Science Daily Magazine. http://www.sciencedaily.com/releases/2006/05/060518075823.htm

13. Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium ,2005. "Initial sequence of the chimpanzee genome and comparison with the human genome". Nature *437: 69-87*
http://www.genome.gov/Pages/Research/DIR/Chimp_Analysis.pdf,
Kenneth R. Miller, professor of biology at Brown University, delivered the keynote address at the University's 242nd Opening Convocation Tuesday, Sept. 6, 2005. http://www.brown.edu/Administration/News_Bureau/2005-06/05-013m.html, National Human Genome Reserach Institue4, 2005,
'Scientists Analyze Chromosomes 2', http://www.genome.gov/1351462
14. New Genome Comparison Finds Chimps, Humans Very Similar At DNA Level,2005, Science Daily Magazine. http://www.sciencedaily.com/releases/2005/09/050901074102.htm

(এর পর ২য় পর্ব পড়ুন)